প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস

কবিরাজ।

"আমি মার কোলে থাকি,
আমার ভয় কি?"

কালীশঙ্কর।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
নববিধান প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
১৮২৫ শক, পৌষ।

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস

কবিরাজ।

"আমি মার কোলে থাকি,
আমার ভয় কি?"

কালীশঙ্কর।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে
কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
নববিধান প্রচারকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
১৮২৫ শক, পৌষ।

মূল্য ৷০ আনা মাত্র।

অশুদ্ধি শোধন।

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১১	১৭০২	[illegible]
"	১৪	[illegible]	[illegible]
৬	৩।৮	দেন	দিন



প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ।

প্রথম জীবন।

জন্ম ও অধ্যয়ন।

বঙ্গদেশ রক্ষণশীল নহে। এ দেশ প্রথম হইতে যে সকল পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছে, ভারতের অন্যান্য দেশ সে পরিবর্ত্তনের অধীন তখন তো হয়ই নাই, পরেও রক্ষণশীলতারক্ষা করিয়া কথঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বল্লাল সেন, রঘুনন্দন, শ্রীচৈতন্য অল্প দিনের মধ্যে কি ঘোর পরিবর্ত্তনসাধনই না করিয়াছেন? মনু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে দৃঢ়মূল করিলেন, জাতিগত বৃত্তিবিভাগ করিয়া জনসমাজের বক্ষে উহাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের শিথিল ভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং জাতিগত বৃত্তিবিভাগের মূল দেশসংস্কারকগণের সংস্কার-কুঠারাঘাতে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না। বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কৌলিন্যপ্রথা গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া কুলের নিয়ম কলঙ্কোৎপাদন এবং শাস্ত্রবিধির উচ্ছেদসাধন করিল, রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রাচীনসংহিতাসকলের মূলশোষণ করিয়া আর্য্য ঔপনিষদ ধর্ম্মকে নির্জীব করিয়া ফেলিল, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবন্যা বর্ণাশ্রমাচারকে ভাসাইয়া লইয়া অকূল সাগরে নিক্ষেপ করিল। এই ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যে জাতিসমুচিত বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-পরিত্যাগ করিয়া মসীজীবী

হইলেন, বল্লাল নৃপতির প্রভাবে অম্বষ্ঠগণ কুলগতবৃত্তি চিকিৎসা-পরিত্যাগ করিয়া ভূসম্পত্তি-অধিকার করিলেন, কায়স্থগণ অনিয়ত-বৃত্তি হইয়া যথেচ্ছ অপরের বৃত্তিতে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে কায়স্থ বৈশ্য ব্রাহ্মণ এবং হীনজাতীয়েরাও গোস্বামী অধিকারী আখ্যা গ্রহণ করিয়া শিষ্য-বৃত্তিতে অন্নসংস্থান করিয়া লইলেন। বাল্যকালে আমাদের সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণবৈদ্যভিন্ন সংস্কৃতব্যবসায়ী কেহ নাই; অল্প দিনের মধ্যে সে সংস্কার আমাদিগের নিকটে বাল্যসংস্কার বলিয়া প্রমাণিত হইল। এই নগরের অদূরে বৈদ্যতিলকবংশ কায়স্থ-কুলসম্ভূত হইয়াও বৈদ্যতিলক, কেবল বৈদ্যতিলক নহে ব্রাহ্মণ-তিলক বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। যে সকল আচারব্যবহার-প্রবর্ত্তনে প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও সাহস করেন না, আজও সে সকল তাঁহাদের বংশে প্রচলিত আছে। কায়স্থ জাতি কোন কালে ধর্ম্মব্যবসায়ী হইতে পারেন না, অথচ এক সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণও কূটপ্রশ্নের মীমাংসার জন্য ইহাদিগের শরণাপন্ন হইতেন। যখন এত বিপর্য্যয় তখন প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্যবৃত্তিতে খ্যাতিলাভ করি-বেন, ইহা আর একটা অসম্ভব ব্যাপার কি? কেবল কায়স্থ-কুলে জন্মগ্রহণ নয়, তৎকুলোদ্ভব গুরুব্যবসায়ী অধ্যাপকের নিকট বেদাঙ্গরূপে গণ্য ব্যাকরণশাস্ত্র তিনি পাঠ করেন। কাল-প্রভাবে এ সকল ব্যতিক্রম এখন সর্ব্বত্র ঘটিতেছে এবং এই ব্যতিক্রমই যে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্য্যাদাস্থাপন করিবে, তাহাতে আমাদের কোন সংশয় নাই। শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বলপূর্ব্বক বংশানুক্রমে বর্ণ-ও-বৃত্তি-রক্ষাকরিবার জন্য যত্ন যে

কোন কালে সফল হইতে পারে না, এ সকল ব্যতিক্রম তাহারই নিদর্শন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রবংশীয়েরা জমীদার বা তালুকদার, বিষয়ী ও জঙ্ঘাজীবী, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বহু গ্রামবিশিষ্ট এক একটি প্রদেশ পরগণা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমগ্র পরগণা বা পরগণার অংশের অধিকারিগণ জমীদার; এক বা ততোধিক গ্রাম বা তাহার অংশের অধিকারিগণ তালুকদার। যাঁহারা রাজা, জমীদার ও তালুকদারের বিষয়কর্ম্মপর্য্যবেক্ষণ করিতেন তাঁহারা বিষয়ী। প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের পিতৃব্য এ দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। বৈশ্যজাতি জঙ্ঘাজীবী, এজন্য ব্রহ্মার উরু হইতে উহার জন্ম শাস্ত্রে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। দেশে বিদেশে পণ্যদ্রব্য-বিক্রয়ের জন্য যাঁহারা পদব্রজে গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা জঙ্ঘাজীবী। পণ্যদ্রব্যবিক্রয় সেকালে ভদ্রবংশীয়েরা আপনাদের হীনতার কারণ বলিয়া মনে করিতেন, এজন্য তিলি তাম্বুলি প্রভৃতি নবশাখগণের মধ্যে উহা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। চিকিৎ-সাব্যবসায়ে তৈল-ঘৃত-ঔষধ-বিক্রয় আছে, এজন্য প্রাচীনকালের লোকেরা চিকিৎসকগণকে জঙ্ঘাবৃত্ত্যবলম্বী বলিয়া গণ্য করিতেন। চিকিৎসকেরাও অনেক সময়ে দুঃখ করিয়া বলিতেন, কি করি 'জঙ্ঘাবৃত্তি অবলম্বন' করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়। প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের পিতৃব্য বাস্তবিকই জঙ্ঘাবৃত্ত্যবলম্বী ছিলেন, কষ্টে সৃষ্টে কোন প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বৈদ্য-গণের পেঁতে অবলম্বন করিয়া তিনি চিকিৎসক হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহুদর্শিত্ববশতঃ তাঁহার চিকিৎসায় পারদর্শিতা ছিল।

চক্ষুতে হানি পড়াতে অন্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, অথচ এই অবস্থায় তাঁহাকে চিকিৎসাকার্য্য করিতে হইত। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে যাঁহারা চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাদের আয় এক প্রকার কিছুই ছিল না বলিতে হয়। কৃষকগণ চিকিৎসার বিনিময়ে তাহাদের ক্ষেত্রজাত ফল-মূল-শস্যাদি-অর্পণ করিত। ভদ্রলোকেরা এক টাকা দর্শনী দিয়া প্রায় তাহাতেই বৈদ্যবিদায় শেষ করিতেন। সে কালে ধান্যাদির মূল্য যদি অতি সামান্য না থাকিত, ঈদৃশ যথাকথঞ্চিৎ আয়ে জীবিকানির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, দেহের সহিত প্রাণ সংযুক্ত রাখাই অসম্ভব হইত। যাহা আয় তাহা ব্যয়, এইরূপে তাঁহার পিতৃব্য সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন। টাঙ্গাইল সবডিভিজনের অন্তর্গত কড়াইল গ্রামে ১৭৬৫ শকের সোমবার (সম্ভবতঃ) ৬ই ভাদ্র প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত রামনাথ দাস, মাতার নাম শ্রীমতীচন্দ্রকলা। জন্মগ্রহণের পর বাল্যকালেই তিনি পিতৃমাতৃ হীন হন, সুতরাং পিতৃব্য শ্রীযুক্ত জয়নাথ দাস, পিতৃব্য পত্নী শ্রীমতী অন্নপূর্ণার উপরেই তাঁহার প্রতিপালনের ভার নিপতিত হয়। তাঁহার পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহার প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

এখন যেমন পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে, সে কালে তাহার কিছুই ছিল না। যাঁহারা বিষয়কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহারা পারস্য ভাষা-শিক্ষা করিতেন। কোন একজন মৌলবী অথবা পারস্যভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি বিনা বেতনে বা স্বল্প বেতনে শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী হইবেন তাঁহারা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের নিকটে অধ্যয়ন করিতেন।

যে কোন শাস্ত্রাধ্যয়নকরা হউক, তৎপূর্ব্বে ব্যাকরণশাস্ত্রপাঠ করিতে হইত। ব্যাকরণ বেদাঙ্গ, সুতরাং মাঘ ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ এ কয়েক মাস মেঘগর্জ্জন হইলেই আর অধ্যাপনা চলিত না। এতদ্ব্যতীত অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি অনধ্যায়তিথি প্রতিমাসেই উপস্থিত হইত। ইহার উপরে অধ্যাপকগণের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণে এবং গুরুব্যবসায়িগণের শিষ্য গৃহে গমনে পাঠবন্ধ থাকিত। এইরূপে বৎসরের মধ্যে ছয় মাস অধ্যয়ন হইত কি না সন্দেহ? যখন ঈদৃশ পাঠের সময়ের সঙ্কোচ, দিনে দুই তিনটি সূত্রের অধিক পড়া হইত না, তখন এক ব্যাকরণ-পাঠে দশবৎসর অতিবাহিত হইবে, এ আর অসম্ভব কি? গৃহত্যাগী বৈষ্ণবব্রাহ্মণভিন্ন গৃহী ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণ-ও-বৈদ্য-ভিন্ন অন্য জাতিকে ব্যাকরণাধ্যয়ন করাইতেন না, সুতরাং প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস ভাদগ্রামস্থ বৈষ্ণবপাড়ায়, কায়স্থকুলোদ্ভব গুরু-ব্যাবসায়ী শ্রীযুক্ত-গতিগোবিন্দ-বৈষ্ণব-সন্নিধানে ব্যাকরণাধ্যয়নজন্য গমন করেন। সেখানে তৎকালের রীতিতে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ দশবৎসর অধ্যয়ন করিয়া কথঞ্চিৎ ব্যুৎপন্ন হন। এক ব্যাকরণপাঠে এতকালব্যয় যদিও তিনি পরসময়ে অতিক্লেশের সহিত স্মরণ করিতেন, তথাপি যখন গত্যন্তর ছিল না, তখন সময়ের অপব্যয় সহ্য না করিয়া আর তিনি কি করিবেন? তিনি স্বয়ং যদি প্রতিভাসম্পন্ন না হইতেন, তাহা হইলে ব্যাকরণে এত পরিশ্রম বাস্তবিকই পণ্ড হইত। আমরা দেখিয়াছি, যে সকল অধ্যাপক বৃত্তি-পঞ্জী-পরিশিষ্ট-প্রভৃতি-সহকারে কলাপ-ব্যাকরণে পারদর্শী, যাঁহারা সভাস্থলে ব্যাকরণের বিচারে মধ্যস্থ মনোনীত হইতেন, তাঁহারাও কোন একটী উদ্ভটকবিতার অর্থ

করিতে গলদঘর্ম্ম হইতেন; সংশোধন করিয়া অর্থ করাতো দূরের কথা। এ কেবল অধ্যয়ন প্রণালীর দোষ। কালপ্রভাবে এখন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যপাঠ হয় বলিয়া এ দোষ প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যাকরণাধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি দূরবর্ত্তী ঢাকা মাণিকগঞ্জের অধীন মত্তগ্রামে চিকিৎসাশাস্ত্রপারদর্শী শ্রীমদ্দুর্গানন্দ সেনের নিকটে বৈদ্যশাস্ত্রাধ্যায়নের জন্য গমন করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ সেন কবিরাজ প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসকে অধ্যয়নবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। পিতা কাব্যশাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, পুত্রও পিতার অনুরূপ। ভাগবত অতি দুরূহ গ্রন্থ, পণ্ডিতবর্গ উহার নিকটবর্ত্তী হইতে ভয় করেন। যুবক অমৃতানন্দ শাস্ত্রচর্চ্চায় অতি উৎসাহী। ভাগবতের দুরূহত্বভেদ করিবার জন্য নিরতিশয় আকাঙ্ক্ষাবশতঃ তিনি কোন এক অধ্যাপকগৃহে গমন করিয়া অপঠিত রাসপঞ্চাধ্যায়ের সহজে ব্যাখ্যা করেন। ঈদৃশ ব্যক্তির সাহায্য যে প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের পক্ষে অতি মূল্যবান্ ছিল তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বৃদ্ধ সেন মহাশয় অনেক সময়ে আপনি অধ্যয়ন করাই-তেন না; পুত্রের প্রতি ভারার্পণ করিতেন। ছাত্রবৃন্দ অতি আহ্লাদের সহিত তাঁহার সাহায্যগ্রহণ করিত। প্রেরিত কালী-শঙ্কর এখানে প্রথমতঃ নিদানশাস্ত্রপাঠ করেন। যাঁহারা সত্বর চিকিৎসাব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে অভিলাষ করিতেন, তাঁহারা বিজয়রক্ষিতকৃত ব্যাখ্যাসহকারে নিদানাধ্যয়ন করিতেন না। তিনিও সেই পন্থাবলম্বন করিয়াছিলেন। এ কথা বলা অনাবশ্যক যে, পর সময়ে তিনি সুশ্রুতাদি মূলগ্রন্থের চর্চ্চা করিয়া

এ ক্ষতির পূরণ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি, সংসারের অনাটন, ইত্যাদি কারণে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রধ্যয়নে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারেন নাই। সুতরাং সাধারণতঃ চিকিৎসায় প্রচলিত সংগ্রহগ্রন্থের দুই এক খানিতে ব্যুৎপন্ন হইয়াই তিনি চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী হন।

মধ্য জীবন।

ব্যবসায়াবলম্বন এবং ধর্ম্মোৎসাহ।

অধ্যয়নসমাপনান্তর প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত তাম্বুলপুরের জমীদারগৃহে পণ্ডিতের কার্য্যগ্রহণ করেন। জমীদারের নাম এবং তাঁহার পিতার নাম একই ছিল বলিয়া জমীদার তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পণ্ডিতের কার্য্যে দিনক্ষয়করা অনুচিত মনে করিয়া তিনি চিকিৎসা-ব্রতে ব্রতী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। রঙ্গপুর জিলায় স্বদেশীয় ব্যক্তি অনেকে আছেন, এজন্য তিনি চিকিৎসাব্যসায় চালাইবার জন্য রঙ্গপুরকেই মনোনীত করিলেন। এখানে কিছু দিন অবস্থান করিলে তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইল। এরূপ খ্যাতির মূলে বিদ্যাবত্তা নহে প্রতিভা ছিল, এ কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কাকিনীয়ার ভূতপূর্ব্ব জমীদার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী আপনাকে নিরন্তর বিদ্বন্মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত রাখিতেন। কোন ব্যক্তিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখিলে, তিনি তাঁহাকে সাদরে আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইতেন এবং তাঁহাকে যথোপযুক্ত স্থান-অর্পণ করিতেন। কাকিনীয়ার জমী-

দারী সে সময়ে দুই অংশে বিভক্ত ছিল, এই দুই অংশেরই চিকিৎসক পদে তিনি নিযুক্ত হইলেন। কবি ও লেখকদিগের প্রতি শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্রের অত্যধিক আদর ছিল। প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস তাঁহার প্ররোচনায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা যত দূর জানি, তাঁহার লেখনীর প্রথমোদ্যমের ফল 'সতীচরিত।' 'সতীচরিত' পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, প্রথম যত্নে ঈদৃশ ভাবরসপূর্ণ আখ্যায়িকা! তিনি কি প্রকারে প্রণয়ন করিলেন। ইহার রচনা শুদ্ধ, ভাব বিশুদ্ধ, গদ্যে রচিত হইলেও কবিত্বরসযুক্ত। স্থানে স্থানে এমনই ভাবধিক্য যে পাঠ করিতে গিয়া নয়ন অশ্রুপূর্ণ হৃদয় উচ্ছ্বসিত, এবং মনে পবিত্ররসের সঞ্চার হয়। আখ্যায়িকাংশে বিশেষ কৌশল আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না, কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যায়ের পর অধ্যায়ের স্বাভাবিক যোগ সে ন্যূনতার লাঘব করিয়াছে।

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস চির দিন পুণ্যের পক্ষপাতী, স্বয়ং অতি নীতিমান্ ছিলেন। কোন প্রকার অসৎকার্য্যের তিনি অনুষ্ঠান করিবেন, বা অপরকে প্রোৎসাহিত করিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভ ছিল। কাকিনীয়ার কর্ম্মস্থলে চিকিৎসকের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরুদ্ধ হওয়াতে, তিনি সে কার্য্যতো করিলেনই না, উহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ধর্ম্মের তীব্র উত্তেজনায় সকল গণনাপরিত্যাগ করিয়া তিনি আর কাকিনীয়া না ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না? ভাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী প্রায় বর্ষে বর্ষে কাকিনীয়ায় গমন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে ইহার সেখানেই পরিচয় হয়।

ইহার মনের যখন ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সেই সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গী হইয়া কাকিনীয়াপরিত্যাগে সুবিধা উপস্থিত। এ সুবিধার প্রতি ক্ষণকাল অবহেলা করা আর তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। বগুড়া জেলায় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ছিল। কাকিনীয়া হইতে সেই স্থানে তিনি গমন করিবেন, ইহা দেখিয়া ইনি তাঁহার সঙ্গী হইলেন। এই সঙ্গই ইহার জীবনে ধর্ম্মসম্বন্ধে মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিদ্বিষ্ট হইবারই কথা, কিন্তু বিদ্বিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী তৎপ্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইনি আপনি চরিত্রবান্, এবং চরিত্রবান্ লোকমাত্রের প্রতি ইহার শ্রদ্ধা গভীর। ব্রাহ্মগণের সচ্চরিত্রতা ইহাকে তাঁহা- দিগের প্রতি চির অনুকূল করিয়াছিল। আপনার কনিষ্ঠের সত্যপ্রিয়তা ধর্ম্মানুরাগের ইনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমাচারে আস্থা নাই, সুতরাং কনিষ্ঠের তৎপ্রতি অনাস্থা- বশতঃ জ্যেষ্ঠের বিরাগভাজন হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে আলাপ করেন। এই আলাপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ইহার আস্থা হয়। এক বার যখন আস্থা জন্মিল, তখন ব্রাহ্মগণের সহবাসে সেই আস্থা সুদৃঢ়মূল করিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ হইবে, ইহা তাঁহার পক্ষে অতিশয় স্বাভাবিক ছিল। সহবাস করিতে গিয়া কাহারও গলগ্রহ হইতে না হয়, এজন্য তিনি কয়েক দিনের জন্য স্কুলের পণ্ডিতের কার্য্যস্বীকার করেন। ব্রাহ্মগণের সঙ্গে কয়েক দিন বাস করিয়া যখন তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল দৃঢ়

হইল। তখন তিনি পুনরায় রঙ্গপুরে আসিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে আমাদের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না। আমরা তখন তাঁহাকে সুশ্রুতাদিচিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়াছিলাম।

রঙ্গপুরে স্থিতি করিয়া তিনি সময়ে সময়ে চিকিৎসার্থ মফঃসলে গমন করিতেন। তাঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া সদ্যঃপুষ্করণীর জমীদারগণ তাঁহাকে পারিবারিক চিকিৎসক করিয়া সেখানে বাস করিতে বাধ্য করেন। প্রেরিত কালীশঙ্কর তৎকালের পদ্ধতির অনুসরণে কিঞ্চিদধিক বয়সে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মানোড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্রসেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। পত্নীর নাম শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী, বয়স সাতবৎসরমাত্র। পিতৃব্য পত্নী একমাত্র গৃহের অভিভাবিকা। তাঁহাকেই ইনি মা বলিয়া ডাকিতেন এবং সে কালে অধিক বয়স পর্য্যন্ত স্তন্যপান দূষণীয় ছিল না, সুতরাং পিতৃব্যশ্বশ্রূর স্তন্যপান করিতেন এবং কন্যার ন্যায় তৎকর্ত্তৃক আদৃতা হইয়াছিলেন। পত্নীর কৈশোর বয়সেই তিনি তাঁহাকে রঙ্গপুরে আনয়ন করিলেন, এবং নবাবগঞ্জস্থ মন্থনায় বড় তরফের জমীদারের বাসায় পত্নীকে স্বীয় পিতৃব্যাণীর রক্ষণাধীনে রাখিলেন। এখানে দুই বৎসর অবস্থানের পর যখন প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলার জন্ম হয়, তখন স্বদেশে তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। পুনরায় যখন তাঁহাকে সদ্যঃপুষ্করণীতে আনয়ন করা হয়, তখন অস্বাস্থ্যনিবন্ধন পিতৃব্যাণী সঙ্গে আসিতে পারেন না। রঙ্গপুরে দাতব্যচিকিৎসালয়ের ডাক্তার দয়াল সিংহ অতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। চিকিৎসার্থ সময়ে

সময়ে তিনি সদ্যঃপুষ্করিণীতে আগমন করিতেন। ডাক্তারী চিকিৎসার প্রতি জমীদারবর্গের আস্থাদর্শন করিয়া কবিরাজ কালীশঙ্কর মনে করিলেন, যে চিকিৎসায় ইহাদের আস্থা আছে, সেইরূপ চিকিৎসার প্রণালীতে ইহাদের চিকিৎসা হওয়া সমুচিত, তাঁহার প্রতি ভয় ও-শ্রদ্ধাবশতঃ ইহাদিগকে কবিরাজী চিকিৎসার অধীন করা কখন ন্যায়সঙ্গত নহে। সুতরাং তিনি আপনি ডাক্তারী চিকিৎসায় নিপুণ হইয়া ইহাদের চিকিৎসা করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া ডাক্তর দয়াল সিংহের নিকটে ডাক্তরী চিকিৎসাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভাদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ইনিও তৎশিক্ষায় যথোচিত সাহায্য করিলেন। সেই হইতে তিনি জমীদারপরিবারের চিকিৎসা ডাক্তরী মতে করিতেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে এরূপ দক্ষতা হইয়াছিল যে, এক সময়ে প্রসিদ্ধ ডাক্তর কৃষ্ণধন ঘোষের প্রেস্ক্রিপশনের মাত্রায় ভ্রম দেখিয়া ঔষধ দেওয়ার সময়ে মাত্রার ব্যতিক্রম করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা লইয়া সে সময়ে আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু কবিরাজ কালীশঙ্কর বিবেচকের কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাতে ডাক্তর ঘোষ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ কালীশঙ্কর নিকটবর্ত্তী জমীদার ও সাধারণ লোকের অত্যন্ত আদরের পাত্র হইয়া উঠিলেন। জমীদার পরিবারবর্গের উপরে তাঁহার প্রভাব এমনই বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, তাঁহারা তাঁহাকে ভয় করিতেন, সম্ভ্রম করিতেন, তাঁহার সম্মুখে কোন প্রকার চাঞ্চল্যপ্রকাশ করিতে পারিতেন না, পরিবারস্থ বালক ও স্ত্রীলোক সকলেই তাঁহার সম্মানরক্ষা করিয়া

চলিতেন। এই সময়ে যে একটী অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহাতে এই ভয় ও সম্ভ্রম যে গভীর প্রীতিমূলক তাহা প্রমাণিত হইয়া পড়ে। কুমারখালির নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটী মুসলমান কন্যা কোন এক কুচক্রীর হাতে পড়িয়া পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করে, এবং রঙ্গপুরের অধীনস্থ গাইবান্ধা সবডিবিজানে আসিয়া উপস্থিত হয়। মুসলমান কন্যাটী ব্রাহ্মণকন্যার ন্যায় অতি সুন্দরী ছিল। সে গাইবান্ধায় আসিয়া বুঝিতে পারিল কি ঘোর বিপদে সে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়াছে। নিরুপায় হইয়া এক জন তত্রত্য মুসলমান মোক্তারকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া সে তাহার শরণাপন্ন হয়। মুসলমান মোক্তার তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইয়া আপনার গৃহে রক্ষা করে। তাহার এই অনুচিত অভিপ্রায় কন্যাটী জানিতে পারিয়া আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। তত্রত্য স্কুলপণ্ডিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী, তিনি তাহার উদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। সবডিবি-জনাল অফিসার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পণ্ডিতমহাশয়ের হস্তে সেই কন্যার রক্ষণভার অর্পণ করেন। পণ্ডিত মহাশয় কন্যা-টীকে আপনার বাসগৃহে আনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবার তথায় না থাকাতে নিজগৃহে একটী যুবতী নারীকে রাখা নিরতিশয় অযুক্ত জানিয়া তাহাকে সদ্যপুষ্করণীতে কবিরাজ কালীশঙ্করের গৃহে লইয়া যান। এ সময়ে ইনি স্বগৃহে উপস্থিত ছিলেন না, অযোধ্যাপুরের জমীদারের অসুস্থতানিবন্ধন তখন অযোধ্যাপুর চিকিৎসার্থ গিয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে এই বলিয়া পত্র লেখেন, একটী কন্যা আসিয়া আশ্রয় লইবে তাহার নামধামাদির বিষয় যেন কিছু জিজ্ঞাসা করা না হয়। কন্যাটী দেখিতে ব্রাহ্মণ

কন্যার ন্যায়, কিন্তু স্বামীর ঈদৃশ পত্রে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তিনি তাহাকে স্বতন্ত্র আহার করিতে দেন। প্রতিবেশিগণ যাই শুনিল কবিরাজের গৃহে একটী অতি সুন্দরী কন্যা আসিয়াছে, অমনি তাহারা দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিল। কন্যাটী দেখিতে ব্রাহ্মণকন্যার মত, সুতরাং বিনা প্রশ্নে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়াই সকলের ধারণা জন্মিল। কন্যাটীও ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া পরিচয়ে কুণ্ঠিত হইল না, সুতরাং আহারব্যবহারের পার্থক্য ঘুচিয়া গেল।

প্রেরিত কালীশঙ্কর চিকিৎসাস্থল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কন্যাটীর আদ্যোপান্তবৃত্তান্তশ্রবণ করিলেন। পত্নী অন্তরালে থাকিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে জানিতে পারিলেন, কন্যাটী মুসলমান জাতীয়া। প্রেরিত কালীশঙ্কর স্থির করিলেন, আর তাঁহার পরিবারের হিন্দুগণ সহ আহারব্যবহারাদির সংস্রবরক্ষাকরা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কন্যাটী মুসলমান কন্যা ইহা তিনি সকলকে অবগত করিলেন, এবং তাঁহার সহিত কেহ আহারাদির সংস্রব না রাখেন বলিয়া দিলেন। না জমীদারবর্গ না চারিদিকের লোক ইচ্ছা করিতেন যে, কবিরাজ জাতিভ্রষ্ট হন, সুতরাং কন্যাটী ব্রাহ্মণকন্যা এই রটনাকেই তাঁহারা স্থিরতর রাখিতে যত্ন করেন। কালীশঙ্কর মিথ্যারটনার অনুমোদন করিয়া সপরিবার হিন্দুগণের সহিত হিন্দুবৎ ব্যবহার করিবেন, ইহা কিছুতেই হইতে দিলেন না। স্পষ্ট কথায় সকল ব্যক্তিকে আমূল সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইলেন। সদ্যঃপুষ্করিণীর জমীদারগণ ব্রাহ্মণবংশজাত, ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহারে তাঁহাদের বিলক্ষণ অভিমান আছে। কবিরাজ জাতিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার সঙ্গে উপবেশনাদি বন্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার স্বাভাবিক ছিল;

কিন্তু তাঁহার প্রতি আদর ও সম্ভ্রম বশতঃ তাঁহারা বাহ্যব্যবহার কিছুই পরিবর্ত্তন করিলেন না। একত্র পানভোজন করিলে জাতিরক্ষা হইবে না, এজন্য তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব ব্যবহারের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইল। অন্য লোক হইলে ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম হইতে তাহাকে অপসৃত করিয়া দেওয়া হইত, কিন্তু কবিরাজ কালী-শঙ্কর ও তাঁহার পরিজনবর্গের যে সম্ভ্রম ছিল, সে সম্ভ্রম যেমন তেমনই থাকিয়া গেল।

প্রেরিত কালীশঙ্করের গৃহে তাঁহার বিধবা ভাগীনেয়ী বাস করিতেন। ইনি অতি অল্প বয়সে স্বামীকে হারাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। শ্রীমান্ হর নাথ দাস সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তিনি রঙ্গপুরের জেলে নায়েব জেলারের কর্ম্ম করিতেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারই সঙ্গে আপ-নার ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেওয়া তিনি স্থির করিলেন। এ সময়ে বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, রঙ্গপুরে স্বতন্ত্র কোন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন নাই। যে রজনীতে বিবাহ হইবে তাহারই অপরাহ্নে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হরনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া রেজেষ্টরার কার্য্য সম্পন্ন করেন। রজনীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালীতে বিবাহ হয়। এতদুপলক্ষে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তিনিই বিবাহে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা প্রেরিত কালীশঙ্কর সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্টযোগে আবদ্ধ হন, এবং গৃহে পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার মনে এখন ব্রাহ্মধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আপনি যে রসপান করিয়াছেন তাহা অপরকে পান

করাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি আর এখন কেবল চিকিৎসক রহিলেন না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যও সংযুক্ত হইল। তিনি বিচারমল্ল ছিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি যাহা বলিতেন, শ্রদ্ধা সহকারে সকলেই শ্রবণ করিতেন।

চিকিৎসোপলক্ষে তিনি সময়ে সময়ে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত ফুলবাড়ী মুনসেফী চৌকীতে গমন করিতেন। সেখানকার মুনসেফী আদালতের উকীল ও আমলাবর্গ সুরাপায়ী ও গণিকাসক্ত ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি কোন আস্থা ছিল না, প্রত্যুত তাঁহারা ধর্ম্ম লইয়া উপহাস করিতেন। কবিরাজ কালীশঙ্কর নিয়মিত উপাসনা প্রার্থনা সঙ্গীত করিতেন। দূর হইতে তাঁহারা সে সকল শ্রবণ করিতেন, এবং এ সকল ব্যাপারকে উপহাসের চক্ষে দেখিতেন; পরস্পরের মধ্যে ইহা লইয়া বিদ্রূপও করিতেন। ইহাদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় অতিমাত্র সন্তপ্ত হইল। কিসে ইহাদের দুরাচার ঘুচিয়া যায় তজ্জন্য উপায়াবলম্বনে তিনি ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচারপটুত্ব, চরিত্রের শুদ্ধতা গোপনে গোপনে তাঁহাদিগের মনের উপরে প্রভাববিস্তার করিল, উপহাস বিদ্রূপ কিছু দিনের মধ্যে শ্রদ্ধায় পরিণত হইল। তিনি তাঁহাদিগের ভাবপরিবর্ত্তনদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে সমবেত-উপাসনাস্থাপন করিতে যত্নশীল হইলেন। সমবেত উপাসনা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তখনও অনেকে তাঁহার মনস্তুষ্টিসাধনোদ্দেশে তাহাতে যোগ দিতেন। তাঁহারা অধিক দিন আর এরূপ ভাবরক্ষা করিতে পারিলেন না; তাঁহার সরল প্রার্থনায় ও ব্যাকুলতায় তাঁহাদের

হৃদয় স্পৃষ্ট হইল। তাঁহারাও প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রার্থনা করিতে গিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। এক-বার পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে পাপে অবস্থানকরা আর সম্ভবপর থাকে না। তাঁহারা স্ব-স্ব-দুরাচার-পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কবিরাজ কালীশঙ্কর মধ্যে মধ্যে ফুলবাড়ী আসিতেন; উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে স্থানীয় লোকদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেন। সময়ে বার্ষিক উৎসব প্রতিষ্ঠিত হইল, প্রচারকবর্গের গতায়াত হইতে লাগিল। তত্রত্য পরিবর্ত্তিত-হৃদয় ব্রাহ্মগণ আজও তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

কাকিনীয়ায় অবস্থিতকালে তিনি "সতী চরিত্র" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, একথায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি। আখ্যায়িকা-প্রণয়নের দিকে এখন আর তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসমুদায় প্রচার করা এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নের লক্ষ্য হইল। ১৭৯৪ শকে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা প্রতিপাদনকরিবার জন্য প্রকাশ্য পত্রিকায় উপ-নিষৎ, গীতা ও মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্থান হইয়াছে এরূপ মত প্রকাশ করেন। ইহা লইয়া কলিকাতায় যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, সুদূর সদ্যঃপুষ্করণীতে তাহা গিয়া উপস্থিত হইলে প্রেরিত কালীশঙ্কর এ সম্বন্ধে নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। তিনি তো নিস্তব্ধ থাকিবার লোক নন; ব্রাহ্মধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্ম নয়, এ সম্বন্ধে তিনি এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া মুদ্রিত করেন। এই প্রবন্ধসম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস বাবু রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়া-

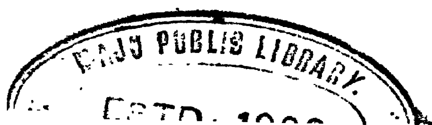
ছেন। ইহা পাঠ করিলে রাজনারায়ণ বাবুর মতের অসারতা অনেক বুঝিতে পারিবেন। কালীশঙ্কর বাবু যে সকল সরল যুক্তি এ সম্বন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের সহজ জ্ঞান আছে তাঁহারা অনায়াসে ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। পুস্তক আমাদের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে মূল্য অতি যৎসামান্য।" এই পুস্তিকাখানি পরে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে বিজ্ঞাপিত হয়,—"শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস প্রণীত 'ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার' বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে। যাঁহারা ইহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা মিশন আফিসে প্রাপ্ত হইবেন।" ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের প্রথম ভাগ ১৭৯৭ শকে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। সেই সময়ের (১লা আশ্বিন ১৭৯৭) ধর্ম্মতত্ত্বে এই গ্রন্থসম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ আছে:—"ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ' নামক একখানি ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর দাস। গ্রন্থকর্ত্তা একজন সুযোগ্য লোক এবং উৎসাহী ব্রাহ্ম। পুস্তকখানি ১৪৪পৃষ্ঠায় নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা পাঠ করিয়া আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি। তর্ক যুক্তি দ্বারা যাঁহারা ধর্ম্মের মূল সত্য বুঝিতে ভাল বাসেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারী হইবে, সন্দেহ নাই। ভাষা অতি সহজ, রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে লেখকের স্বাধীন চিন্তা-শক্তিরও কিছু কিছু পরিচয় আমরা পাইলাম। বিষয়গুলি যদিও বৈজ্ঞানিক, কিন্তু লেখার গুণে নীরস বোধ হইল না; গ্রন্থকার স্থানে স্থানে ভক্তিভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন। মফঃস্বলের ব্রাহ্মগণ এরূপ সদুদ্দেশ্যে যদি পরিশ্রম করেন তাহা হইলে তাঁহা-

দের এবং সমাজের অনেক মঙ্গল হয়। এরূপ পুস্তক প্রণেতাকে উৎসাহ দেওয়া ব্রাহ্মগণের উচিত। আমরা ভরসা করি, এই গ্রন্থপাঠে সকলেই প্রীতিলাভ করিবেন।"

'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ' প্রথম ভাগ প্রথম সংস্করণে নয় অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। ১৭৯৯ শকে উহার দ্বিতীয় ভাগ যখন মুদ্রিত হয় তখন শেষ দুই অধ্যায় উপাসনাবিষয়ক বলিয়া দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, এজন্য ১৮০৮ শকে যখন উহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তখন অন্তিম দুই অধ্যায়বর্জ্জিত সাত অধ্যায়ে গ্রন্থ শেষ হয়। জগৎ, জড়জগৎ, প্রাণিজগৎ, অধ্যাত্মজগৎ, একাত্মবাদনিরসন, ঈশ্বর, গুরু বা আচার্য্য, প্রথম ভাগ 'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের' এই সাতটি আলোচ্য বিষয়। যাঁহারা এই অধ্যায়গুলি পাঠ করিবেন তাঁহারা প্রেরিত কালীশঙ্করের প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় লাভ করিবেন। প্রথম অধ্যায়টি পাঠ করিয়াই পাঠকের বিশ্বাস জন্মিবে, ইনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্যথা কম্‌ট ও মিলের মতের উল্লেখ করিয়া তিনি তাহার সদোষত্ব প্রমাণ করিবেন কি প্রকারে? কিন্তু ইহা এখন সকলেই জানেন যে, তিনি কোন কালে ইংরাজী ভাষা-অধ্যয়ন করেন নাই, অথচ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে প্রকাশিত এই দুই পণ্ডিতের মত পাঠ করিয়া তাহার অন্তস্তম প্রদেশে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা প্রথম অধ্যায়ের দুইটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"কোমত জগতের তত্ত্বনির্ব্বাচন জন্য যে তিন প্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করেন, তাহার উন্নতির ক্রম ধরিয়া দেখিলে আমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, কাল যত অতীত হইয়াছে, অনুসন্ধান যত বাড়িয়াছে, মনুষ্যগণ ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

কেন না পৌরাণিক সময়ে বরুণ জলের দেবতা বলিয়া পূজিত ছিলেন, দার্শনিক সময়ে সেই বরুণের দেবত্ব দূর হইয়া শৈত্য-শক্তির আধার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন ; পরে বৈজ্ঞানিক সময়ে সেই বরুণ উদজন ও অম্লজনের সমষ্টি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা, পরে দাহিকা শক্তিসম্পন্ন জড়, তৎপর রাসায়নিক কার্য্যের ফল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে বুঝিতে অতি সহজ যে, যখন মনুষ্যগণ জড়বস্তুতে ঐশী শক্তি আরোপ করিতেন, তখন তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। দার্শনিক সময়ে তাঁহারা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন তৎপর বিজ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়া মনুষ্যদিগকে আলোক দান করিল। তখন মনুষ্য বুঝিল যে নিয়ম ভিন্ন কিছুই হয় না। কোমত বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্য আর কিছুই জানিতে পারে না, এ কথা মিথ্যা ; কেন না নিয়ম কার্য্য, কার্য্য কি কখন কারণ ভিন্ন হইতে পারে? অতএব যেমন কার্য্য তেমন কারণ আছেই আছে ; যেমন নিয়ম তেমনই নিয়ন্তা আছেই। সুতরাং নিয়মের সঙ্গে নিয়ন্তাকে বুঝাও স্বাভাবিক। কোমতও নিয়ন্তা না বুঝিয়া এই শৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের কার্য্যে মনোযোগ দিতে সমর্থ হন নাই, তবে তাহা অপরিজ্ঞেয় বলিয়া চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এই মাত্র। যাহা হউক, মনুষ্য যখন দার্শনিকদিগের কল্পিত বন্ধুরতাপূর্ণ সোপান অতিক্রম করে এবং বিজ্ঞানরূপ সমতল প্রশস্ত ক্ষেত্রে পদার্পণ করে, তখনই তাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। বিজ্ঞানই ঈশ্বরের বিচিত্র বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণ ভূমি। এই ভূমিতে পদার্পণ করিবা-মাত্র মনুষ্য বুঝিতে পারে, জগতের সমুদায়ই নিয়মের অধীন।



সূর্য্য সৃষ্টিকাল হইতে শূন্য আকাশে ঝুলিয়া রহিয়াছে, নিয়মে; চন্দ্র সেই সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, নিয়মে। বিদ্যুৎ নির্ঘোষিত হয়, নিয়মে; পক্ষিসকল উড়িয়া যায়, নিয়মে, কুলায় নির্ম্মাণ করে, নিয়মে, ডিম্ব প্রসব করে ও শাবক পোষণ করে, নিয়মে। বায়ু বহিয়া জগতে প্রাণ বিতরণ করে, নিয়মে। ধূলি উড়িয়া যায়, নিয়মে। মনুষ্যমনে কখন কুভাব কখন সুভাব উদিত হয়, নিয়মে। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, নিয়মে; নির্ব্বাণও হয় নিয়মে; এবং তৃণকাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, নিয়মে। মেঘ আকাশে সজ্জিত হয়, নিয়মে; বারিবর্ষণ করে, নিয়মে। যেমন নিয়ম ভিন্ন কার্য্য হয় না, তেমনি নিয়ন্তা ব্যতীতও নিয়ম হয় না। কোমত বলিয়াছেন, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই, আমরা বলি, নিয়ম ভিন্ন মনুষ্যের অতি সহজ জ্ঞাতব্য নিয়ন্তা। সুতরাং এস্থলে আমরা কোমতের শাসন মান্য করিতে পারি না। কেন না উৎপন্ন বলিলে উৎপাদক, সৃষ্টি বলিলে স্রষ্টা এবং নিয়ম বলিলে নিয়ন্তা, স্বাভাবিকরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন কোন সম্প্রদায় বলেন, জগতের মূল উপাদান ভূত বা পরমাণু সকল নিত্য। সেই পরামাণুপুঞ্জের যে পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি আছে, তাহারা সেই প্রকৃতির বলে নিয়মিত হইয়া কার্য্য করে, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনাবশ্যক। আমরা এরূপ অন্ধতা স্বীকার করিতেও সম্মত নহি। প্রত্যেক উৎপন্নের উপযোগিতা দেখিলে, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখিলে, উৎপাদক বা স্রষ্টার মহান্ ভাব আপনা আপনি হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। সুতরাং যাঁহারা দেখিয়া শুনিয়াও তাদৃশ মঙ্গল

নির্ব্বন্ধী ভাব গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদিগকে অজ্ঞতার দোষ হইতে চেষ্টা করিলেও বাঁচান যায় না।"

জনষ্টুয়ার্টমিলের মত সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—"কিন্তু মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্টমিল ঈশ্বরকে তেমন অনন্তগুণের আধার বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কেবল মিল কেন? কোমতও বলিয়াছেন, 'নিঃসন্দেহ প্রকৃতিকার্য্যে দোষ আছে।' ইঁহারা এরূপ বলেন কেন? হয়ত তাঁহারা প্রাকৃতিক কার্য্য-কলাপে অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়াছেন, হয়ত ঈশ্বরের অপার কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে দয়া ও প্রেমের বৈষম্য দেখিয়াছেন। নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাহার নিগূঢ় কারণ বাহির করিতে পারেন নাই, এজন্য ঈশ্বরকে অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত-জ্ঞানের আধার না বলিয়া শক্তিমান্, জ্ঞানবান্, দয়াবান্ মিল স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কোমত তাহাও করেন নাই। তিনি কেবল এই বলিয়া নাস্তিক হইতে নিষেধ করিয়াছেন যে, যদি ঈশ্বরকে মানা যায়, তবে আমাদের কার্য্যকরী বুদ্ধিবৃত্তির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায়, নতুবা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার কোন বাধা দেখা যায় না। কোমত যদি ঈশ্বর না মানিয়া কার্য্যসাধিকা বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, নাস্তিক হইতেন। তাঁহারা যে প্রকৃতির দোষ আছে বলিয়া প্রকৃতির স্রষ্টার ত্রুটি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ঈশ্বরকে অস্বীকার করাই ভাল ছিল। কেন না ইহাতে প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর গভীরতার মধ্যে তাঁহাদের অনেক যত্নে প্রবেশ করা বিফল হইয়াছে। বহু দিন শিক্ষা করিয়া, বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, বহু গুরুর মত লইয়া তাঁহারা প্রাকৃতিককার্য্যবিধের কিয়ৎ পরিমাণে

যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা দৃঢ় করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার সৃষ্টিকৌশল অল্পমাত্র বুঝিতেই তাঁহাদিগের জ্ঞান পরিশ্রান্ত ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে, সেই স্রষ্টা ভূমা ঈশ্বরের কার্য্যে ত্রুটি আছে বলিয়া নিজের অভ্রান্ততা ও সেই অভ্রান্ত ঈশ্বরের ভ্রান্তিমত্তা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কি সামান্য কৌতুকাবহ। তাঁহারা বড়জ্ঞানী, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত, কিন্তু এ স্থলে অজ্ঞান ও অহঙ্কারের পরিমাণ বেশি হইয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে। কেন না ইহা অতি সহজেই বুঝাযাইতেছে, সৃষ্টির অপার কৌশল ও নিয়ম দর্শন করিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, অথচ নিজের ক্ষুদ্রতা ও ভ্রান্তি পশ্চাতে রাখিয়া ঈশ্বরের ত্রুটি দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। ...”

এই প্রথম ভাগের নানা স্থান হইতে আমরা এমন সকল অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, যাহাতে পাঠকগণ তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইতেন, কিন্তু উদ্ধৃতাংশ দ্বারা গ্রন্থবাহুল্য করা অপেক্ষা সমগ্র মূল গ্রন্থ, পড়িবার জন্য প্রবৃত্তি-উদ্দীপনকরাই ভাল, এজন্য আমরা সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম। একাত্মবাদ-নিরসননামক অধ্যায়ে প্রেরিত কালীশঙ্কর আপনার তীক্ষ্ণ মনীষার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। শঙ্করের মতের দোষোদ্‌ঘাটন অনেক আচার্য্যই করিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে সকল দোষ দিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া কিছুতেই সহজ নহে। যে মত খণ্ডনে বহু আচার্য্য বহুপরিশ্রমস্বীকার করিয়াছেন, তাহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের কথার পুনরুক্তি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ইনি বিষয়টি এমন ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তাহার খণ্ডন এমন

প্রণালীবদ্ধরূপে করিয়াছেন যে খণ্ডনগুলির মধ্যে নূতনত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। "একাত্মবাদ" এই আখ্যাটী আলোচ্য বিষয়ের ঠিক উপযোগী হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায় না। এক আত্মা ভিন্ন আর কিছু নাই সকলই অলীক, এইঅর্থ ধরিয়া তিনি 'একাত্মবাদ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'একাত্মবাদ' সদোষ নির্দোষ উভয়ই হইতে পারে। যেখানে স্বরূপের একতা একাত্মশব্দের অর্থ, সেখানে উহা নির্দ্দোষ। যেখানে একাত্মশব্দে এই বুঝায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সত্তা ছিল, সে সত্তা আত্মার সত্তা এই আত্মা ভিন্ন তখনও কোন পদার্থ ছিল না, এখনও কোন পদার্থ নাই; তবে যে আত্মাতিরিক্ত পদার্থের বিদ্যমানতা প্রতীত হইতেছে, উহা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। এই শেষোক্ত সদোষ অর্থগ্রহণ করিয়াই প্রেরিত কালীশঙ্কর 'একাত্মবাদ' নাম দিয়া শাঙ্কর-মত-খণ্ডন করিয়াছেন। এখানে একথা বলা প্রয়োজন যে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে ভাবে সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছেন, সেই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াই 'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজে' তাঁহার মত খণ্ডিত হইয়াছে। তখন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকে যথাযথ বুঝিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার খণ্ডন যদি অযথা তীব্রতাদোষে দূষিত হয়, তাহা ক্ষমার যোগ্য।

১৭৯৯ শকে "ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের" দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগের অন্তিম অধ্যায়দ্বয় এই ভাগের প্রথমে সংযুক্ত হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উপাসনাতত্ত্ব নিবদ্ধকরাই এ খণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রথমে ধর্ম্মের প্রকৃতিসম্ভূতত্ব, তৎপর উপাসনার প্রয়োজনীয়তা, উপাসনার পাত্র, উপাসকের যোগ্যতা এবং

যোগ্যতাসাধনের আয়োজন কি, এই গুলি এ খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সংযম, বিশ্বাস, অনুরাগ, ব্যাকুলতা, দীনতা, প্রীতি ও ভক্তি, তাঁহার মতে এই গুলি যোগ্যতাসাধনের আয়োজন। একথা বলা অতিরিক্ত যে, এই গ্রন্থের প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা তিনি নূতন ভাবে করিয়াছেন। ধর্ম্মকে তিনি প্রকৃতসম্ভূত বলিয়াছেন, ইহা মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের অতি পুরাতন কথা। পুরাতন কথা বটে, কিন্তু ধর্ম্মকে দায়িত্বরূপে দাঁড় করান, ইহার মধ্যে ইহাতে নূতনত্বের গন্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "একটি দায়িত্বের নাম ধর্ম্ম। দায়িত্ব কি? কিসের জন্য মনুষ্য দায়ী হইতে পারে? আলোচনা করিলে জানা যাইবে, মনুষ্য কেবল স্বীকৃত বা অঙ্গীকৃত বিষয়ের জন্য দায়ী; অন্য কিছুরই জন্য সে সেরূপ দায়ী নহে। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোক প্রভৃতি সমস্ত বিশ্বরাজ্যের একমাত্র রাজা, তিনি মনুষ্যজাতিকে সৃজন করিলেন এবং আপন অসীম রত্নভাণ্ডার হইতে দীন হীন ও সহায়সম্পৎশূন্য সেই মনুষ্যকে কিঞ্চিৎ দান করিলেন। হতদরিদ্র ও অক্ষম মনুষ্য প্রভুর সেই দান পাইয়া সমস্ত জগতের মধ্যে অতি প্রতাপশালী হইল। মনুষ্য তুলনা করিয়া বুঝিল যে প্রভুর কৃপাতে সে সমুদায় সৃষ্টির প্রধান হইয়াছে। তখন সে তাঁহার অসীম মহিমা ও প্রভাব দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতাতে অবনত হইল এবং তাঁহার নিকট প্রণতমস্তকে স্বীকার করিল, 'হে প্রভো, আমি চিরকাল তোমার আদেশ পালন করিব। আমার প্রতি অনুজ্ঞা কি তাহা প্রকাশ কর।' তখন প্রভু প্রসন্নতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, তোমাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিও। আর মনে রাখিও তোমার কিছুই

ছিল না ও নাই। যাহা কিছু সম্পদ্ তাহা আমার। এ সকল আমার সম্পদ্ জানিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। সাবধান! তুমি যাহা পাইয়াছ, তাহার সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে কষ্ট পাইবে। আর সীমার মধ্যে থাকিয়া প্রার্থনা করিলে আমি তোমাকে আরও অনন্তকাল দান করিব।' মনুষ্যও বিনীত ভাবে 'এই আজ্ঞা পালন করিব' বলিয়া স্বীকার বা অস্বীকার করিয়াছে। এখন সেই মনুষ্য যদি সেই আজ্ঞা পালন না করে, তবে সে জন্য সে প্রভুর নিকট অবশ্যই দায়ী।"

এই কথাগুলি শুনিতে মনে হয়—কবিত্ব; কিন্তু ইহা কবিত্ব নহে, অতি সত্য। সংসারে সকলেই কোন না কোন একটি ধর্ম্ম মানে, এবং যাহার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে যে ধর্ম্ম প্রবাহক্রমে অবতরণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মকে আপনার ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহারই অনুসরণ করে। এরূপ অনুসরণে প্রকৃতভাবে ধর্ম্মের অনুসরণ হয় না বলিয়াই জীবনের উপরে উহার কোন প্রভাব নিপতিত হয় না, উহার দ্বারা জীবনের মূল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হয় না; ধর্ম্ম যে একটী জীবন্ত সামগ্রী, ইহা জীবনে প্রমাণিত হয় না। যত দিন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরজ্ঞান না জন্মিতেছে, তাঁহার দানের নিমিত্ত মানুষ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার আজ্ঞা-পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইতেছে, তত দিন তাহাতে ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় না। মনে হয়, এ কার্য্য সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হয় না, সাধন-সাপেক্ষ। যদি সাধনসাপেক্ষ হইল, তাহা হইলে "ধর্ম্ম প্রকৃতি-সম্ভূত" একথা কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে না। ঈশ্বর আছেন, তিনি আমায় সকল দিয়াছেন, যাহা দিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণপাশে বদ্ধ, তিনি আমায় যাহা বলিবেন, তাহা

আমার প্রতিপালনকরা অবশ্য কর্ত্তব্য ; এগুলি যদি মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বলিয়া কোন সামগ্রী থাকিতে পারে না। প্রকৃতিস্থ মানুষের মনে এই সকল কথা উদিত হয় ; কিন্তু বিষয়াভিলাষাদি বিবিধ অন্তরায় উপস্থিত হইয়া কথাগুলিকে ঢাকিয়া ফেলে। এক বার ঢাকিয়া ফেলিলে পুনরায় উহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস হয় বলিয়াই, ওগুলি যেন "প্রকৃতিসম্ভূত" নয় যত্নসাধ্য, এইরূপ মনে হয়।

প্রত্যেক আলোচ্য বিষয় নূতন ভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সে সকলের দৃষ্টান্ত তুলিয়া সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তের কলেবর বৃদ্ধি করা সঙ্গত নহে। তবে যাঁহার জীবন লিখিত হইতেছে প্রকৃতভাবে তাঁহার অমরাংশের কথঞ্চিৎ পরিগ্রহ হয় এজন্য যতটুকু উল্লেখের প্রয়োজন সেই টুকুর উল্লেখ করিতে আমরা বাধ্য। ইহাও বলা আবশ্যক, প্রতিজনের অমরাংশের সমগ্রভাব অপরে বুঝিবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প, সুতরাং এ সম্বন্ধে ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব। সে ত্রুটি পরম্পরাক্রমে সময়ে অন্তরিত হইবে, ইহা আশা করিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। যাহা হউক, প্রেরিত কালীশঙ্করের মধ্যজীবনের আর গুটি কয়েক কথা নিবদ্ধ করিয়া আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব। আমরা এ কথা বলিতে পারি না যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, উহা তাঁহার করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় ছিল। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া ভ্রমপ্রমাদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, একথাও তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় না। তবে তিনি যাহা যতটুকু জানিতেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে কিছুতেই কুণ্ঠিত হইতেন না। সংস্কৃতে কাব্য নাটক-রচনা করিবেন এ প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল

না; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান প্রাচীন ভাষায় গ্রথিত করিয়া উহার স্থায়িত্বসম্পাদনে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমদ্দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর দর্শনশাস্ত্রে অতি ব্যুৎপন্ন। বঙ্গভাষায় দর্শনশাস্ত্রপ্রচার তাঁহার জীবনের কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর মহোদয় এখন যেরূপ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি নিবদ্ধ করেন, তত্ত্ববিদ্যা সেরূপ নহে। উহা অতি জটিল বলিয়া এক কালে অনেকে তৎপাঠে বিরত থাকিতেন। প্রেরিত কালীশঙ্কর কঠিন বলিয়া পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না, তিনি সমগ্র তত্ত্ববিদ্যা কেবল আয়ত্ত করিলেন তাহা নহে, উহার বিষয়গুলি সংস্কৃত পদ্যে নিবদ্ধ করিলেন। এই তত্ত্ববিদ্যার সমালোচনায় দর্শনশাস্ত্রের অভ্যন্তরে তিনি যে অধিকতর প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে কি না তিনি কোন একটি বিষয় আয়ত্ত করিতে গিয়া সম্পূর্ণ তাহারই হইতেন না, আপনার স্বাভাবিক প্রতিভাবলে উহাকে নবীনাকারদান করিতেন, তাই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার লেখার মধ্যে তত্ত্ববিদ্যার দার্শনিক জটিলতা প্রবেশ করে নাই, সহজ স্বাভাবিক ভাবে তত্ত্বসকল সাধারণের বোধগম্যরূপে তিনি বিন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, তিনি ধর্ম্মতত্ত্বাদি পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। এ স্থলের আদিশব্দের মধ্যে তত্ত্ববিদ্যা, বঙ্গদর্শন এবং সাময়িক মাসিক পত্রিকাসকলের গভীর তত্ত্বসম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি পরিগণিত করিয়া লইতে হইবে। তিনি আপনি ধর্ম্মতত্ত্বের নিকটে বিশেষ ঋণস্বীকার করিলেও, এ সকলের নিকটে তাঁহার ঋণ যে অল্প ছিল, তাহা আমাদের মনে হয় না।

জ্ঞানচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সাধন ভজন প্রভৃতি প্রথম হইতে যাঁহার অন্নপান ছিল, তাঁহার জীবন যে বৈরাগ্যপ্রধান হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি চিকিৎসায় যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু এ অর্থের ব্যয় নিজের সুখসাধনের নিমিত্ত নহে, অপরের সাহায্যজন্য ব্যয়িত হইত। স্বদেশ বিদেশ হইতে রোগী আসিয়া তাঁহার গৃহে স্থান পাইত, ঔষধ পথ্যাদি সকলই তিনি নিজ ব্যয়ে যোগাইতেন। তাঁহার গৃহ কেবল বন্ধুবান্ধবের অভ্যর্থনার স্থান ছিল তাহা নহে, কাহাকেও কাহাকেও স্বগৃহে রাখিয়া তাঁহাদের সমগ্রভার তিনি নিজে বহন করিতেন। আপনার অধ্যাপকের বংশজ শ্রীমান্ নবদ্বীপচন্দ্র দাস এ বিষয়ে প্রমাণস্থল হইয়া আজও বিদ্যমান আছেন। ইনি অল্প বয়সে রঙ্গপুর জিলার অন্তর্গত রেলকা নবাবগঞ্জে পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। দূর দেশে একাকী তিনি বাস করিবেন ইহা শ্রেয়স্কর মনে না করিয়া প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস তাঁহাকে নিজগৃহে আনয়ন করেন, সদ্যঃপুস্করণীর স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত করান এবং আপনার তত্ত্বাবধানে রাখেন। কাহাকেও আশ্রয় দিলে তৎপ্রতি তিনি কি প্রকার ব্যবহার করিতেন, সেই মুসলমান কন্যার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শন করে। পরের জন্য স্বার্থত্যাগ, আপনার বলিয়া কিছু না রাখা, ইহাই যদি বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে উহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি পর দুঃখে দুঃখী ছিলেন, বিশেষতঃ যাহারা স্খলিতচরিত্র ঈশ্বরভ্রষ্ট তাহাদিগের কিসে চরিত্রলাভ হয়, ঈশ্বরের আশ্রিত হইয়া চিরদিনের জন্য নিরাপদ হয়, এজন্য তিনি যে নিরতিশয় আকুল

ছিলেন, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় আমরা তাঁহার জীবনে পাইয়াছি। ঈশ্বরভ্রষ্ট অসচ্চরিত্রদিগের উপহাসাদিতে তিনি কোন কালে ভগ্নোদ্যম হইবার লোক ছিলেন না। সত্যের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার যে অটলবিশ্বাস ছিল, তাহাতেই তাহারা যে পরাভবস্বীকার করিবেই করিবে, কখনও তাঁহার যত্ন চেষ্টা অতিক্রম করিতে পারিবে না, এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে অণুমাত্র সংশয় স্থান পায় নাই। যাঁহাদের প্রকৃতির ভিতরে অদম্য উৎসাহ বিদ্যমান এবং সে উৎসাহ ঈশ্বরবিজ্ঞানের ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য এই প্রকারই হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, তাঁহার জীবনের চরমাংশ মধ্যজীবন প্রসূত।

অন্ত্য জীবন।

বিষয়কর্ম্মত্যাগ।

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের প্রেরিতত্বলাভের পূর্ব্ব জীবন কথঞ্চিৎ বিবৃত হইল। এখন তাঁহার জীবনের সেই অংশসম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত, যখন তিনি সংসারের কার্য্যভার হইতে অপসৃত হইয়া প্রচারকার্য্যে সমগ্র জীবনোৎসর্গ করিলেন। উপরে তাঁহার জীবনের যে সকল কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি সংসারের সেবায় চিরদিন বদ্ধ থাকিবেন, তাঁহার জীবন সেরূপ জীবন নয়। 'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ'-প্রণয়ন ও প্রচারের বর্ষাধিক কাল অতীত হইলে তাঁহার প্রথম পুত্রের (১৭৯৮ শকে, ২৯ পৌষে) জন্ম হয়। তাঁহার এই পুত্রের জন্মের সঙ্গে পারিবারিক এমন ঘটনা সংযুক্ত আছে, যাহাতে এই দেখাইয়া

দেয় যে, পতিপত্নীর নিত্যসম্বন্ধবিষয়ে অনেক বর্ষ পরে সংহিতায় যে বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে সে বিধি ঈশ্বরপ্রেরণায় তিনি সেই সময়েই পালন করিয়াছিলেন। এই ঘটনাসূচক শব্দে পুত্রের নাম অমৃতাঙ্কুর রক্ষিত হইয়াছিল। মৃত্যু যাহার সম্বন্ধে অবধারিত ছিল, সে মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পার্থিব-আলোক-দর্শন করিল, ইহাতে প্রেরিত কালীশঙ্কর তন্মধ্যে অমৃতের ব্যাপার দেখিবেন, ইহা আর কিছু বিচিত্র কথা নহে। প্রথম পুত্রের জন্মের দুই বৎসরমধ্যে (১৮০০ শকে, ১৫ অগ্রহায়ণে) দ্বিতীয় পুত্রজন্ম গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামানুসরণ করিয়া তাহার নাম প্রেমাঙ্কুর রক্ষিত হয়। এত দিন প্রেরিত কালীশঙ্কর কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই। যদিও কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই, গ্রন্থ প্রণয়নাদিদ্বারা তিনি সকলেরই পরিচিত হইয়াছিলেন। কুচবিহারবিবাহের আন্দোলনে তাঁহার গৃহে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা আচার্য্যের বিরোধী হইলেন, একা তিনিই বিশ্বস্ত রহিলেন। মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী, এবার তিনি কলিকাতায় গিয়া উৎসবসম্ভোগ করিবেন মনে করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সকলেরই আনন্দ হইল, সকলের অপেক্ষা কেশবচন্দ্রের আহ্লাদের সীমা ছিল না। সঙ্কীর্ত্তনের পর কমলকুটীরের বারাণ্ডায় যখন নৃত্য হয়, সে সময়ে তিনি মাথায় চাদর বাঁধিয়া নিজের রচিত 'শমন তুই পালা শমন তুই পালা ব্রহ্মদূত এলো" এই গানটি গাইয়া কি যে প্রমত্ততায় সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, আজও তাহা বিস্মৃত হইতে পারা যায় নাই। এইহইতে তিনি বৎসর বৎসর কলিকাতায় আসিতে লাগিলেন এবং কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত তাঁহার প্রীতিবন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইল।

সংসারের সেবাপরিত্যাগ করিয়া জনসমাজের সেবায় জীবনার্পণকরিবার পূর্ব্বে এক কন্যা ও দুই পুত্রের ভার ভগবান্ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন, ইহাদের প্রতি মমতা তাঁহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। ধনাগমের দ্বার বন্ধ হইয়া গেলে পুত্র-কন্যার কি দশা হইবে, ইহা চিন্তাকরিবার তাঁহার অবসর ছিল না। ক্ষুদ্র পরিবারের সেবায় বদ্ধ না থাকিয়া বৃহৎ মানবপরিবারের সেবার জন্য যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল, তাঁহার সে ব্যাকুলতার পরিপূর্ত্তির উপায় স্বয়ং ভগবানই করিলেন। ১৮০২ শকে নববিধান ঘোষিত হইল, এবং প্রচারকগণ প্রেরিত নামে আখ্যাত হইলেন। ১২ চৈত্র বৃহস্পতিবার প্রেরিতবর্গ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাত্রা করেন। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সপরিবারে রঙ্গপুরে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে সদ্যঃপুষ্করণীতে প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের গৃহে উপস্থিত হন। তাঁহার পত্নী অসুস্থা ছিলেন সুতরাং তাঁহার গৃহে দীর্ঘকাল বাস করিতে তিনি বাধ্য হন। কেবল পত্নীর পীড়া নহে, আপনিও কষ্টকর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হন। প্রেরিত কালীশঙ্করের পত্নী স্বামীর অনুবর্ত্তী হইয়া রোগিগণের শুশ্রূষানিরতা ছিলেন। তিনি ভাই গৌরগোবিন্দ ও তাঁহার পত্নীর যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা কোন কালে বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে। স্বামিগৃহে আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না, দ্রব্যজাত স্বচ্ছন্দ পরিমাণে গৃহে সর্ব্বদা রক্ষিত থাকিত। সুতরাং রোগী বা অরোগী দ্রব্যাভাবে কাহারও কোন প্রকার সেবার ত্রুটিহইবার সম্ভাবনা ছিল না। ভাই গৌরগোবিন্দ কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী দিন দিন রোগে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পরিশেষে এত দূর হইল যে তাঁহার

আর উপাসনায় যোগ দেওয়ার সামর্থ্য রহিল না। প্রেরিত কালীশঙ্কর সংসারবিরাগী ছিলেন, প্রতিদিনের উপাসনায় তাঁহার মনে প্রধূমিত বৈরাগ্যবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি উপাসনাকালে প্রার্থনানুরূপ আত্মরচিত সঙ্গীত গাইতেন। সেই সকল সঙ্গীতের মধ্য হইতে দুইটি সঙ্গীত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহাতে তাঁহার মনের ভাব সকলে সহজে বুঝিতে পারিবেন।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

সংসারী মানব, ফলবাদী সব, ফলহীন কর্ম্ম করে না কথন। সর্ব্বফলদাতা, তুমি পরিত্রাতা, তোমা ত্যজি করে ফল অন্বেষণ।

যে জন তোমায় ভজে দিয়া প্রাণ মন, তুমি তার দুঃখ রাখ না কথন, আপনি হও তার অন্ন বস্ত্র জল, হও পিতা মাতা আত্মীয় সকল; বাসনার আবাস আরামের স্থল (দয়াময় হে) তুমি হয়ে মুখ্য ফল পূরাও আকিঞ্চন।

তোমার যে দাস ফলচিন্তাহীন, সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সন্তুষ্ট অদীন, দেখিয়া সকলে করে অনুভব, আছে তার গৃহে অতুল বৈভব, এই জন্য তোমায় পূজে হে মানব (দয়াময় হে) তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু দারিদ্র্যভঞ্জন।

তোমার অভয়পদে জীবন সঁপিলে, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে, সেই লোভে তোমায় পূজে সর্ব্বজন, শুদ্ধ প্রেমের জন্য দেয় না জীবন, এই অপবাদ করিতে মোচন, তুমি প্রেমিকের কর সর্ব্বস্বহরণ।

যে ভজে তোমায় ত্যজিয়া অসার, ফলাফলের চিন্তা রাখ না তাহার, অন্ন বস্ত্র আর গৃহ ধন জন, হরে লও পুত্র কলত্র জীবন,

তথাপি সে জন সুখী অনুক্ষণ, তোমার মুখ চেয়ে করে জীবন-ধারণ।

জলযোগে ফুল্ল কমল যেমন, তব যোগে তব ভকত তেমন, তব শক্তিযোগে জীবনকমল, প্রেমজলে ভাসে সর্ব্বদা অটল, সংসারবায়ুতে হয় না চঞ্চল, হেন অপরূপ হেরি নাই কখন।

আমার এ চিত্ত করি ফলাফল, ব্যস্ত দিবানিশী বিষম চঞ্চল, বিনা তব ঐ চরণকমল, হয় না প্রভু কভু জীবন সফল, বুঝাও এই কথা ঘুচাও মনের ব্যথা, তুমি সর্ব্বফলের আশা কর হে পূরণ।

আউলিয়া সুর।

তুমি হাড়ে লক্ষ্মী রাখ না হে সে জনার।

ঠাকুর! বড় ভাল বাস যারে এম্‌নি দশা করে তার।

রাখ না পিতা মাতা, রাখ না অন্নদাতা, পুত্র মিত্র পরিবার; ওহে তোমায় ভালবাসার ফলে, ও তার বুক ভেসে যায় চক্ষের জলে, প্রাণ সঁপে চরণতলে, আনন্দ ধরে না আর।

তুমি যায় ভাল বাস, আগে তার বুদ্ধি নাশ, পাগল করে দিয়ে হাস, একি মধুর ব্যবহার; (সে জন) হাসে কাঁদে নাচে গায়, ভাবে মজে দিন কাটায়, ভয় ভাবনা মিটে যায়, তোমায় দিয়ে সকল ভার।

তোমার এই ভক্ত জনে, দেখায়ে জগজ্জনে, ঢুকিয়ে দাও সবার মনে, প্রেমিক জনের ব্যবহার; প্রেমিক এই সম্পদ পেলে, ইন্দ্র-পদকে পায়ে ঠেলে, কাঙ্গাল হরিদাস বলে, এম্‌নি ভুলাও মন আমার।

এই সময়ে সর্ব্বজনবিখ্যাত কার্লাইলের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর উপলক্ষে যে প্রার্থনা হয়, সেই প্রার্থনাবলম্বনে তিনি এই সঙ্গীতটি রচনা করিয়া গান করেন :—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

শক্তি বিচিত্র তোমার। বিচিত্র বিভূতি, বিচিত্র মূরতি, বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র আচার।

বিচিত্র কৌশল করিয়া যোজনা, করিলে বিচিত্র জগত রচনা, চিত্রপরিণাম বিচিত্র সূচনা, বিচিত্র এ চিত্রাগার।

ঔষধ ওষধি ত্বক্ পত্র মূল, শাক সূপ তৃণ তরু ফল ফুল, তোমারি বিচিত্র বিভূতি অতুল, সতত করে প্রচার; গ্রহপতি সহ যত গ্রহগণ, উপগ্রহ রাশি নক্ষত্র করণ, নিজবাহু মূলে করিয়া স্থাপন, ঘুরাইছ অনিবার।

মাস পক্ষ আদি যামিনী বাসর, সপর্য্যায় ষড়ঋতু সংবৎসর, নিয়ত ঘুরাও নাহি অবসর, সাধিতে শুভ অপার; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বিহঙ্গ, মাতঙ্গ তুরঙ্গ সারঙ্গ কুরঙ্গ, সঙ্গে বিহরিয়া করি কত রঙ্গ, বিচিত্র তব বিহার।

দেখাতেছ তুমি থাকিয়া নয়নে, শুনাতেছ তুমি থাকিয়া শ্রবণে, বুঝাতেছ মনে অতি সঙ্গোপনে, ধন্য তুমি সূত্রধার; ঔষধেতে কর রোগ নিবারণ, শস্য শাক সূপ ক্ষুধার কারণ, শরীর পোষণ রক্ত সঞ্চালন, করিতেছ সবাকার।

দেখিয়া এ সব বিচিত্র মহিমা, বিচিত্র প্রেমের বিচিত্র প্রতিমা, বিচিত্র তোমার সৌন্দর্য্য গরিমা মজে না মন আমার, আবাল্য যে তব চিন্তাতে মগন, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র করে দরশন, তাহার শোণিতে আমার জীবন, চালাও ওহে বিশ্বাধার।

প্রেরিত কালীশঙ্কর দিন দিন অধিকতর প্রেমে মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে যে সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতে ছিল, এখন তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তিনি জমীদারগণকে বলিলেন, আর তিনি চিকিৎসাকার্য্যে জীবনাতিপাত করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে পরম প্রভুর সেবাকার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিতে হইতেছে; তাঁহারা অন্য চিকিৎসক আনয়ন করিয়া নিযুক্ত করুন, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার চিকিৎসাকার্য্য-ত্যাগে সকলেই অতিমাত্র ব্যথিত হৃদয় হইলেন। যাহাতে তিনি কার্য্যত্যাগ না করেন, তজ্জন্য নানাদিক্ হইতে অনুরোধ উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি আর কোন অনুরোধের মুখাপেক্ষা করিলেন না। তাঁহার পত্নী নিজেও আকুল হইয়া পড়িলেন। প্রচারক-বর্গের অবস্থার সমুদায় তত্ত্ব তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। পুত্রকন্যা লইয়া সামান্যভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে, অন্ন বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে, এ সকল তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তাঁহার মুখ মলিন হইল, নিরতিশয় চিন্তার সাগরে ভাসিলেন। তিনি জানিলেন, তাঁহার স্বামী যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিবেন না, সুতরাং নিজের মনের বিষাদ নিজের মনে বিলীন ভাবে রক্ষা করিলেন। প্রতিদিনের উপাসনায় তাঁহার স্বামীর মন বিচলিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া তিনি উপাসনার প্রতি এক দিন বীতরাগ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ভাই গৌরগোবিন্দ সেখানে আর দীর্ঘকালস্থিতি পরিবারের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে, ইহা জানিয়া পীড়াবসন্না পত্নীকে প্রেরিত কালীশঙ্করের যত্ন-ও-চিকিৎসাধীনে রাখিয়া অসুস্থ শরীরে হলদীবাড়ী যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি পোলীস

ইন্‌স্পেক্টর শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের গৃহে কয়েক দিনমাত্র ছিলেন। এখানেই নাগাসন্ন্যাসী ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই সময়ে পত্নীর শয্যাশায়িত্বের সংবাদ পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে পুনরায় সদাঃপুষ্করিণীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পত্নী উত্থানশক্তিবর্জিতা। তিনি অতি সাবধানে তাঁহার পত্নীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। প্রেরিত কালীশঙ্কর ঔষধ যথোপযুক্ত-রূপে যোগাইতে লাগিলেন, কিন্তু আর কিছুতেই কোন ফল-প্রদর্শনের অবস্থা ছিল না। তাঁহার পত্নীর মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে, তাঁহার চিকিৎসা যথোচিত হইল, তৎসম্বন্ধে কোন ত্রুটি ঘটে নাই। কয়েক দিন সেবা শুশ্রূষার পর তাঁহার পত্নী (৩০ আষাঢ় বুধবার, ১৮০৩ শকে) পরলোকগমন করিলেন। পত্নীর শেষ অভিলাষের অনুসরণ করিয়া ভাই গৌরগোবিন্দ পুত্রদ্বয়কে তাহাদিগের মাতামহীর নিকটে প্রেরণ করেন। এই সময়ে ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্র ভাই গৌরগোবিন্দকে কলিকাতায় যাত্রা করা সমুচিত বলিয়া পত্র লিখেন, কিন্তু রঙ্গপুরে প্রচার করিতে যাওয়া তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না। রঙ্গপুরে প্রচার করিয়া কয়েক দিন পর তিনি আবার সদাঃপুষ্করণীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রেরিত মণ্ডলীসহ প্রেরিত কালীশঙ্করকে মিলিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাঁহার পরিজনবর্গসহ শ্রাবণ মাসের শেষভাগে কলিকাতায় যাত্রা করেন। প্রেরিত কালীশঙ্কর ও তাঁহার পরিজনবর্গ কলিকাতায় সাদরে সকলের

কর্তৃক গৃহীত হইলেন। মঙ্গলপাড়ার ভাই গৌরগোবিন্দের গৃহে তাঁহাদিগের বাসস্থান হইল। প্রচারকার্য্যে জীবনোৎসর্গকরিবার অভিলাষ শ্রীদরবারে জ্ঞাপনকরাতে তিনি পরীক্ষাস্থলে গৃহীত হন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীদরবারে (১৪ ভাদ্র, সোমবার, ১৮০৩ শকে) এই নির্দ্ধারণ হয়:—"শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া প্রচারকার্য্যে জীবন সমর্পণ করাতে সভার নিয়ম অনুসারে এক বৎসরকাল পরীক্ষায় থাকিলেন। তিনি চিকিৎসাকার্য্য ত্যাগ করিবেন না, ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উহা রাখিবেন। বর্ত্তমানে তিনি রঙ্গপুর প্রদেশে থাকিয়া কার্য্য করিবেন।" তিনি ভাই গৌরগোবিন্দের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা ও পালনের ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে উহাও শ্রীদরবারের বিবরণগ্রন্থে এইরূপে লিপিবদ্ধ হয়:—"শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের বালকদ্বয়ের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।"

১৩ ই ভাদ্র ভাদ্রোৎসবের পর দিনে প্রেরিত কালীশঙ্কর এক বৎসরের জন্য পরীক্ষাস্থলে গৃহীত হন, এ কথা তিনি তাঁহার দৈনন্দিনলিপিতে এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন:—১৪ ভাদ্র সোমবার—"এই দিন যে কন্‌ফারেন্স হয় তাহাতে এক বৎসর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্ব্বাচিত এবং রংপুর প্রদেশে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য করিতে অনুমতি হয়।" ইহার পর দৈনন্দিনলিপিতে কিছু লিখিত হয় না। ২৩ভাদ্র হইতে যাহা তিনি লেখেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

২৩ শে ভাদ্র বুধবার—শান্তিপূর্ণ ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বরানুভব।

২৪ শে ভাদ্র বৃহস্পতি—নিরাশাতে আশার সঞ্চার। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমীশ্বরম্॥

২৫ শে ভাদ্র শুক্রবার—উদরাময়ের জন্য উপাসনা সম্পূর্ণ হইল না।

২৬ শে ভাদ্র শনিবার—এই দিন বৈকালে রংপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিবার জন্য রংপুরে যাওয়া হয়।

২৭ শে ভাদ্র রবিবার—প্রাতঃকালে প্যারীলাল রায় মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা ও আহার হয়। বৈকালে মতিলাল বাবুর বাসাতে সমাজ হয়।

২৮ শে ভাদ্র সোমবার—প্রাতঃকালে ফুলবাড়ী রওনা। ১॥ টার সময় পঁহুছিয়া আহারান্তে বিশ্রাম। রাত্রিতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা।

২৯ শে ভাদ্র মঙ্গলবার—রাত্রিতে বন্ধুদিগের সহিত রাত্রে উপাসনা ও সারমন্ (উপদেশ) দেওয়া হইয়াছিল।

৩০ শে ভাদ্র বুধবার—রাত্রিতে মাতৃভাবের উপাসনা ও প্রার্থনা সকল বন্ধুগণের সঙ্গে।

৩১ শে ভাদ্র বৃহস্পতি—রাত্রিতে কয়টি বন্ধু সহ একত্র উপাসনায় মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ।

১ লা আশ্বিন শুক্র—ফুলবাড়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই দিন বড়ই স্বর্গীয় বল সঞ্চারিত হইয়া অলৌকিক ভাবে দীন হীন দাসকে কৃতার্থ করে। ইহার পর দুই দিন কৃতজ্ঞতাতে হৃদয় অবনত থাকে।

২রা আশ্বিন শনিবার—দিনের গাড়ীতে রংপুর যাত্রা করিয়া
রাত্রিতে রংপুরে পঁহুছি।

৩রা আশ্বিন রবিবার—রংপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিয়া রাত্রিতে
কৈলাস বাবুর সঙ্গে অনেক আলাপ।

৪ঠা আশ্বিন সোমবার সদ্যঃপুষ্করণীর বাসাতে প্রেরিত কালী-শঙ্কর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শনিবার পর্য্যন্ত তথায় স্থিতি করেন। রবিবার রঙ্গপুরে মতিলাল বাবুব বাসায় সামাজিক উপাসনা-নির্ব্বাহপূর্ব্বক পরদিন প্রাতে পুনরায় বাসায় প্রত্যাগমন করেন। ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে তিনি দৈনন্দিনলিপি এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন :—

১২ই আশ্বিন মঙ্গল—এই দিন স্ত্রী ও এক জন বন্ধুর জন্য বিশেষ
প্রার্থনা করা।

১৩ই আশ্বিন বুধবার—পত্নীর স্বভাবে কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।
এই দিন বড় প্রার্থনায় বল আসিয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতি—শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবুর সঙ্গে গয়া যাইব
সংকল্প করিয়া বাটী হইতে বাহির হই।
পথে লোকাভাবে বড় কষ্ট পাই। রেলওয়ে
ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীর জন্য প্রায় ৩॥ ঘণ্টা
বসিয়া থাকি, তৎপর জ্বর আইসে। এই
জ্বর সহ বহু কষ্টে নবাবগঞ্জে প্যারী বাবুর
বাসায় যাই। গয়া যাইব কৈলাস বাবুর
ইচ্ছাতে মনে করিয়াছিলাম, আমার মন
বড় ইতস্ততঃ করিতেছিল, বস্তুতঃ জ্বরের
জন্য কিছু হল না। দিনের বেলা কান্তি
বাবু সহ উপাসনা।

(১৪ই আশ্বিন বৃহস্পতি)—কৈলাস বাবুর সঙ্গে কাছারীতে
সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বাসায় যাই, আর
জ্বর আইসে।

এই দিনের এবং পরপর দিনের লিপি পাঠ করিয়া আমাদের তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। একটু দূরে রোগী দেখিতে হইলে যিনি পালকীভিন্ন গতায়াত করিতেন না, গৃহ হইতে বাহির হইতে গেলে যাঁহার লোকের কোন অভাব হইত না, তিনি আজ বাসা হইতে পদব্রজে কায়ক্লেশে দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে যাইতে গিয়া শ্রান্তিজনিত জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। জ্বরে কাতর অথচ রংপুরের ষ্টেশন হইতে অতি কষ্টে দূরবর্ত্তী নবাবগঞ্জে বিনা যানে বন্ধুগৃহে আশ্রয় লইলেন। এই প্রথম তিনি প্রচারকজীবনের কষ্টানুভব করিলেন। স্বয়ং বহুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া এত দিন যিনি সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়াছেন, পদব্রজে কোথাও গমন যাঁহার পক্ষে দীর্ঘকাল অনভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যৌবনাবসানে পরিণত বয়সে সমস্ত পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি অকিঞ্চন-ব্রতাবলম্বন করিয়াছেন, কাহারও নিকটে আপনার জন্য কিছু প্রার্থনা করিতে পর্য্যন্ত যিনি অধিকার হারাইয়াছেন, অবমানিত হইয়াও যাঁহার আত্মসম্ভ্রমরক্ষার জন্য দুটী কথা বলা ব্রতবিরোধী, তিনি আজ যে কষ্টে কষ্ট এবং অবমানিত হইয়া অশান্তি অনুভব করিবেন ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। নিজের অদম্য উৎসাহে তিনি পর সময়ে মানাপমান-ও কষ্টানুভব-পর্য্যন্তকে পরাজয় করিয়া-ছিলেন, রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও প্রভুর কার্য্যসম্পাদনে নিরন্তর অনলস ছিলেন সত্য, কিন্তু এই অকিঞ্চনব্রতই যে তাঁহার জীবন-নিঃশেষের কারণ হইয়াছিল, ইহা আমারা তাঁহার জীবনের

চরম ভাগে দেখিতে পাইব। যাহা হউক, আবার আমরা তাঁহার দৈনন্দিনলিপি উদ্ধৃত করিতেছি।

১৬ই আশ্বিন শনিবার—জ্বরবিশ্রামের পর রাত্রিতে নানা ভাব ও চিন্তার সম্মিলনে উপকৃত। স্বয়ং যেন পিতা হৃদয়ে বসিয়া উৎসাহ অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন।

১৭ই আশ্বিন রবিবার—রাত্রিতে সামাজিক উপাসনায় বড় মাধুর্য্য আসিয়াছিল। কান্তি বাবু আর আমি, আনন্দের সীমা নাই। মধ্যাহ্নকৃত্যও ভাল হইয়াছিল।

ভৃত্য অনুচিত উদ্ধতাসূচক কথা বলাতে রাত্রিতে মনে কিছু অশান্তি ঘটিয়াছিল অতি অল্প।

১৮ শে আশ্বিন সোম—শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ উপাসনাতে বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।

১৯ শে আশ্বিন মঙ্গল—মধ্যাহ্নকালের উপাসনাতে বড় আনন্দ। বৈকালে পুনর্ব্বার জ্বর হইয়া বড় কাতর করে।

২০ শে আশ্বিন বুধ—শ্রদ্ধেয় কান্তি বাবু সহ মধ্যাহ্ন উপাসনা হয়, সামান্য ভাবে। শরীর বড় দুর্ব্বল।

২১শে আশ্বিন বৃহস্পতি—ভৃত্য না থাকা ও প্রতিদিন জ্বর হওয়াতে যদিও বড়ই ক্লেশ হইত, কিন্তু ভ্রাতা কান্তি মণির সঙ্গে একত্র উপাসনাতে সে কষ্ট দূর হইত।

২২ শে আশ্বিন শুক্র—এই দিন পত্নীর অনুরোধ পত্র পাইয়া রংপুর হইতে বাসায় আসি। এ ঘটনাটি একটি প্রত্যাদেশ কেন না ইচ্ছা ছিল না তবু আসিলাম। কে যেন আনিল।

ইহার পর চারি দিনের দৈনন্দিনলিপিতে পত্নীর মরণাপন্নাবস্থার কারণ, এবং তৎসম্বন্ধে কি কি অনুষ্ঠান তাঁহাকে করিতে হয় তাহা বর্ণিত আছে। কাহারও সাহায্য না পাইয়া আপনি পত্নীর ক্লেশাপনয়ন করিতে যত্ন করেন, কিন্তু নিজে কিছু করিতে পারিলেন না এবং পারা অসম্ভব দেখিয়া রংপুরে টেলিগ্রাফ করেন, এবং অন্তরের প্রেরণায় ("কে যেন প্রার্থনা করিতে বলিল, সুতরাং অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে থাকি") প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হন। ২৫শে আশ্বিন সোমবার এইরূপ অবিশ্রান্ত প্রার্থনায় অতিবাহিত করেন, পর দিন প্রত্যুষে পত্নীর ক্লেশের কারণ আপনা হইতে অপনীত হইল। এই ব্যাপারে যে তিনি "সাক্ষাৎ আনন্দময়ী আসিয়া' এ কার্য্য করিলেন ইহা বিশ্বাস করিবেন,তাহা তাঁহার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ছিল, কেন না তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া যাহা হওয়া অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, তাহা সহজে আপনা হইতে হইয়া গেল। ভগবানের কৃপায় আসন্ন মৃত্যু হইতে পত্নী রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু পরীক্ষার অবসান হইল না। ২৭শে ২৮শে আশ্বিনের দৈনন্দিনলিপিতে আমরা এই কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই :—"নিজের শরীরের অসুস্থতা পত্নীর পীড়ার জন্য বড়ই থেজালত ও অসুখের মধ্যেও আনন্দে ছিলাম।" "এই হইতে আর অবসর নাই, রাত্রি দিন পত্নী ও পুত্রের জন্য ব্যস্ত ছিলাম।" ৭ই কার্ত্তিক ফোঁড়া দেখা দিয়া প্রায়বিংশতিদিন-

ব্যাপী ক্লেশের পর ফোঁড়া আপনি গলিয়া গিয়া পত্নীর পীড়া-সাম্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু এক পক্ষের মধ্যে পুনরায় পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া ৮ই অগ্রহায়ণ "নিউমোনিয়ার লক্ষণ" উপস্থিত হয়। প্রেরিত কালীশঙ্করের পত্নীর প্রথমকাতরতার কারণ যে দিন অপনীত হয়, তাহার পর দিন (২৭ আশ্বিন) ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিই তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর অবস্থা কলিকাতার বন্ধুবর্গকে অবগত করেন। ভাই কালীশঙ্কর অসুস্থ শরীরে পত্নী ও কনিষ্ঠ পুত্রের সেবাশুশ্রূষায় দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, এ সংবাদ যখন কলিকাতায় পঁহুছিল, তখন তাঁহাকে সপরিবারে কলিকাতায় আনয়নকরিবার জন্য কেশব চন্দ্র নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য ভাই গৌর-গোবিন্দ রঙ্গপুরে গেলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া ২২ শে অগ্র-হায়ণ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

প্রেরিত কালীশঙ্কর সপরিবার কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্ববৎ মঙ্গলপাড়ায় বাস কবিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীর দেহে অল্পে অল্পে সুস্থতার লক্ষণ দেখা দিল বটে, কিন্তু যান্ত্রিকবিকারের কিছু প্রতীকার হইল না। পরীক্ষায় "প্লুরসি" প্রকাশ পাইল, এবং এই রোগের হস্ত হইতে তাঁহার নিষ্কৃতির সম্ভাবনা অতি অল্প, চিকিৎসকগণের এই প্রকার ধারণা হইল। পত্নীর রোগের ঈদৃশাবস্থায় তিনি হতাশ্বাস হইলেন না। তাঁহার পত্নীর শরীর কিঞ্চিৎ সবল হইলেই আপনার প্রস্তুতী "ছাগাদ্য ঘৃত" তাঁহার সেবার জন্য তিনি আপনি ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইল। যাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া চিকিৎসক-

গণ অবধারণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই ঔষধ সেবনে অদ্যাবধি জীবিত আছেন। প্রেরিত কালীশঙ্কর কলিকাতায় স্থিতি করিয়া উপাসনাপ্রার্থনায় উৎসাহের সহিত কেবল যোগ দিতেন তাহা নহে, সেই সকলকে জীবনের অন্নপান করিবার জন্য আপনার দৈনন্দিনলিপিতে প্রায় প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতেন। ১৭ই ফাল্গুন একটী প্রার্থনা লিপিবদ্ধ আছে। এ মাসে দৈনিক প্রার্থনা আচার্য্যের পুত্রবধূ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয় নাই ; সুতরাং এটি দৈ:নক প্রার্থনার সার, অথবা নিজের প্রার্থনা ইহা স্থির করা সুকঠিন। প্রার্থনাটী এই :—"প্রাণের হরি, তুমি জান পশু আর মানুষ এক গৃহে কি কষ্টে কালযাপন করে। ভূতের সঙ্গে দেবতার মিলন কবে হয় ? দৈত্য দানবেরা চিরকাল দেবশত্রু, কিন্তু মার খেতে সুতারের পুত্রই পায়, তোমার পুত্র দেবপুত্র মার খাবেন কেন ? এক ঘরে, হে হরি. সুতার ও দেবতা থাকিলে সুতারের কৃত অপরাধে কি দেবপুত্র দাণ্ডত হইবেন ? আমিত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। কোথায় সুতার আর কোথায় দেবতা। এই যে গৃহে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিরা আছেন, ইহারা গরিব, ছেঁড়া মলিন বস্ত্র পরিধান করেন, মন্দ আহার করেন, মন্দ পান করেন, তাই কি ইহারা মন্দ ? ইহাদিগকে আমি তৈয়ার করি নাই, তুমি দিয়াছ। তোমারই কন্যা পুত্র। কিন্তু ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত মলিন বলিয়া ইহাদিগকে অমান্য করিব কিরূপে ? ইহারা যে তোমার।" প্রার্থনাটী পাঠ করিলে এটী যে তাঁহার নিজের মনের ভাবানুরূপ তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পরিজনবর্গসহ একহৃদয়ত্ব না হইলেও তাঁহারা ঈশ্বর-প্রদত্ত, ঈশ্বরপ্রেরিত, মালিন্যসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে সেই জন্য

সম্ভ্রম করিতে হইবে, এই কথাগুলি দেখাইয়া দেয় তাঁহার মনে তৎকালে সময়ে সময়ে যে আন্দোলন উপস্থিত হইত, তাহারই প্রশান্তিজন্য এই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় পুত্র প্রেমাঙ্কুর সুস্থ শরীর ছিল না। দিন দিন তাহার অসুস্থতা বাড়িয়া চলিল, পরিশেষে ৩২ শে আষাঢ় (১৮০৪ শক) রাত্রি দুই প্রহরের সময় সে পরলোকে গমন করে। এই দিনের দৈনন্দিনলিপিতে এই মাত্র লিখিত আছে, "রাত্রি দুই প্রহর কালে টুনি তিন বার মা মা ডাকিয়া লোকান্তর গমন করিল।" প্রেমাঙ্কুরের 'টুনি' ডাকনাম ছিল। পুত্রের মৃত্যুর পর ৯ই শ্রাবণ তিনি রঙ্গপুরে যাত্রা করেন। ১০ই শ্রাবণ প্রাতে কুড়ীগ্রামে পঁহুছেন। এখানে সপ্তাহকাল উপাসনা আলোচনা উপদেশ তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। সপ্তাহান্ত দিনে রঙ্গপুরে এবং তথা হইতে তিন দিন পরে সদ্যপুষ্করণীতে যান। এখানে তাঁহার বাসায় এক্ষণে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনা করেন। ২২ শে শ্রাবণের উপাসনাসম্বন্ধে তিনি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন, "বেদ শ্রুতি পুরাণ আগম এই চারি মূল সত্য যথাক্রমে যে ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইটি প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।" সদ্যঃপুষ্করণী হইতে তিনি পীরগাছা যান, এখানে এক দিন আলোচনাভিন্ন যে কোন বিশেষ কার্য্য হয়, তাহার কোন নিদর্শন নাই। পীরগাছা হইতে কুড়ীগ্রাম, কুড়ীগ্রাম হইতে কাউনীয়া, কাউনীয়া হইতে ফুলবাড়ীতে গমন গমন করেন। ৩০ শ্রাবণ তিনি ফুলবাড়ীতে যান; ২ রা ভাদ্রের দৈনন্দিন লিপিতে তিনি লিখিয়াছেন "প্রাতঃকালে ফুলবাড়ী-সবান্ধব উপাসনা, এই উপাসনা ও প্রার্থনাতে বড়ই আনন্দলাভ

হইয়াছে, উপস্থিত বন্ধুগণ বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছেন।” ৪ঠা ভাদ্র কলিকাতা-যাত্রা করিয়া পথে দামুকদিয়ার ‘বড়কষ্ট’ ভোগ করিয়াও প্রত্যূষে পঁহুছিয়া ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় যোগ দেন। এখন হইতে তাঁহার দৈনন্দিনলিপিতে পূর্ব্ববৎ দৈনিক প্রার্থনার সার দেখিতে পাওয়া যায়। ৩রা আশ্বিন আবার তিনি রঙ্গপুরে গমন করেন। মনে হয়, এবার তিনি প্রচারোদ্দেশে তথায় যান নাই। সদ্যঃপুষ্করণীতে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরিবার যে আয়োজন ছিল, সেই আয়োজন হস্তান্তরকরিবার জন্য এবার তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। দৈনন্দিনলিপিতে প্রচারকার্য্যের উল্লেখ নাই। মাসাধিক কাল রঙ্গপুর প্রদেশে থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৩ মাঘ রবিবার (১৮০৪ শক) তাঁহার তৃতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই দিনের দৈনন্দিন লিপিতে লিখিত আছে, “এই দিন বেলা ৩টার সময় একটি পুত্রসন্তান জন্মে। ইহাতে দয়াময়ী মার প্রত্যক্ষ জীবন্ত দয়া দর্শন করিয়া অবাক্ হই। পত্নী ঘোরতর রোগাক্রান্ত, নড়িবার ও নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার সাধ্য ছিল না। অন্যান্য সন্তান হইবার সময় দুই তিন দিন মরণোপম যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। আশ্চর্য্য! এবার অল্প সময়ে ধাত্রীর বিনা সাহায্যে সন্তান প্রসূত হইল।” ১৮০৫ শকের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে প্রেরিতগণের প্রতি বিধি প্রচারিত হয়। এই দিন হইতে সিমলায় গমনের দিন পর্য্যন্ত শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের যে সকল প্রার্থনা হয় দৈনিক প্রার্থনায় তাহা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ২১ চৈত্র (৩ এপ্রেল) যে প্রার্থনা হয় সেই প্রার্থনা-টীমাত্র “দল হইতে বিদায়” নামে দৈনিক প্রার্থনায় লিপিবদ্ধ

আছে, তাহার পর আর প্রার্থনা লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের দৈনন্দিনলিপি হইতে, তৎপর যে সকল প্রার্থনা হইয়াছিল তাহার সার এখানে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

২২ চৈত্র (৪ এপ্রেল) বুধবার—হে হরি, আর প্রতিকার তবে হইবে না। আর কোন উপায় নাই, ইহারা বলিতেছেন। ইহারা ঔষধ আর খাইবেন না। ঔষধ না খাইলে আশা কি? বিনা ঔষধেতো রোগের প্রতিকার হয় না।

২৫ শে চৈত্র শনিবার—গুরু পাপী শিষ্য পুণ্যবান্; গুরুর গলায় বিষ্ঠার হাঁড়ী, শিষ্যবর্গ অতি গৌরবাস্পদ ভদ্র লোক, এ স্থলে মিল হওয়া অসম্ভব। একত্র নৌকা ছাড়িলাম, একত্র চলিলাম, এখন শেষ কালে ছাড়িয়া চলিলাম। মিল যে হয় না, ঠাকুর! আমিতো মিল করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আমার এত দোষ থাকিতে কেমন করিয়া নির্দ্দোষীদের সঙ্গে মিলিবে।

২৬ শে চৈত্র রবিবার—ভিক্ষু জীবন পবিত্র, ভিক্ষান্ন পবিত্র।

২৭ শে চৈত্র সোমবার—উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারী কেহ হয় না কিন্তু অতি সামান্য কাজ করিয়া দিন কাটাইতে চায়।

২৮ চৈত্র মঙ্গলবার—পুথি লেখা বক্তৃতা করা যাহাদিগের কাজ তাহারা তোমার লোক নহে। চণ্ডাল তোমার গৃহে যাইতে পারে না ব্রাহ্মণ পারে। আমরা যে প্রার্থনা করি, তাহা পিতা মাতার নিকটে সন্তান যেরূপ করে সেরূপ নহে, রাজার নিকট দূরদেশবাসী প্রজা যেমন দরখাস্ত লিখিয়া পাঠায় আমরা তাই করি। যদি ঠিক ছেলের মত আবদার করিতে পারিতাম, তুমি ও ঘরে গেলে সঙ্গে গেলাম, এ ঘরে এলে সঙ্গে এলাম, এইরূপ আঁচল ধরিয়া যদি বেড়াইতে পারিতাম, তবে অবশ্যই কিছু না

কিছু পাইতাম, কিন্তু তাহাতো পারিলাম না। তৃণ পত্রাদি সব তোমার পরিচয় দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমিতো যার হইতে পারিলাম না।

২৯ শে চৈত্র বুধবার—রাজ পুত্রের জন্ম দিনে উপলক্ষে তাহার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা।

৩০ শে চৈত্র বৃহস্পতিবার—অবিশ্বাস তো গেল না। স্থিরতর নিশ্চিত ভূমিতে তো কেহ অদ্যাপি দাঁড়াইল না। হে ঈশ্বর, তোমার দোষ নাই, সব দোষ আমাদের।

১লা বৈশাখ (১৩ এপ্রেল) শুক্রবার—নূতন বৎসরে নব জীবন পাইব পাপ রাজ্য হইতে ডুব দিয়া পুণ্যরাজ্যে যাইব। ব্রাহ্মসমাজ আর থাকিবে না, নববিধানরে নব জীবন লইয়া নূতন বৎসরে প্রবৃত্ত হইব। ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ বুদ্ধ কন্‌ফুস্ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া নূতন প্রেমের রাজ্য সংস্থাপন করিব।

২ রা বৈশাখ, শনিবার—হে সন্ন্যাসীর ঈশ্বর, পূর্ব্বে বৈরাগ্য আসিয়াছিল, নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল, নববিবাহিত পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস গৌরকে লইয়া শ্রীক্ষেত্রে গেল। সে সন্ন্যাস আর কি ফিরিবে না? আমরা সকলেই বিষ্ণুপ্রিয়া হইব, সন্ন্যাসীর কি সন্ন্যাসিনী হইবে না। সন্ন্যাসী কি চির কাল স্ত্রীবিহীন থাকিবে? ঈশ্বর বিবাহ দেও।

৩রা বৈশাখ, রবিবার—হে প্রেমের ঈশ্বর, সংসার বনে আমি সুখে থাকিব, আর আমার ভাই গুলি দুঃখে মরুক; ধর্ম্ম বনে আমিও দুঃখ পাব, আর ভাই ভগ্নীগুলিকেও দুঃখ দিব। নব-বিধান বনে, ফাঁক কথা থাকিবে না; সকল শাস্ত্রের অর্থ পরি-বর্ত্তিত করিয়া নূতন অর্থ করিব। যে সত্য আছে সকলে পাবে,

বস্ত্র সকলে পরিবে, আমি উপবাসী থাকিব, আমি ছেঁড়া নেকড়া পরিব। আমি ছাতী হইয়া সকল রৌদ্র সহ্য করিব, ভ্রাতারা আমার ছায়ায় বাস করিবে। আমি গৃহ হইব, ভ্রাতারা আমাতে বাস করিবে।

৫ বৈশাখ মঙ্গলবার—হে মিলনের ঈশ্বর, অমিল আর রাখিও না। আমাদিগের প্রতি দয়া করিয়া এক হইতে শিখাও, আমরা এক এক জনে এক এক যন্ত্র বাজাইব, কিন্তু সুর ও তাল রাগ ও রাগিণী এক হইবে। যে আমাদের ভিতরে থাকিয়া ভিন্ন সুরে ভিন্ন তালে বাজায় সে অদ্রভ লোক। আমরা কয় জনে মিলিয়া এক খানি শরীর হইব। এক শরীরের যে কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে যেমন সকল শরীরে লাগে, আমাদিগকে সেইরূপ কর।

৬ বৈশাখ বুধবার—হে প্রেমের হরি, আমি পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা ফিরাইয়া লইলাম। ইহারা—এই বন্ধুগণ আর আমার সঙ্গে যাইতে পারিতেছেন না। ইঁহারা দুইটি পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াই পরিশ্রান্ত হইয়া আর চলিতে পারিতেছেন না। আমি বন্ধুদিগের জন্য কি না করিলাম? মিথ্যাবাদী হইলাম, চুরি ডাকাতি সকলই যে করিলাম।

৭ বৈশাখ বৃহস্পতিবার—হে বিশ্বাসীর পিতা, তুমি কি সত্য সত্যই নাই। এই যে আমার বন্ধুগণ বলিতেছেন তুমি নাই। তুমি আর উত্তর দেও না, কান্দিলে শুন না। আমাদিগের দেশে পিতৃহীন বলিলে বড় শক্ত গালি হয়। চোর বল, দস্যু বল বদমায়েশ বল তাহা সয়, কিন্তু তোমার পিতামাতা নাই, এ কথা সয় না।

৮ বৈশাখ শুক্রবার—হে ঈশ্বর, প্রেম স্বর্গেও আছে পৃথিবীতেও

আছে। স্ত্রী স্বামীকে স্বামী স্ত্রীকে পিতামাতা পুত্রকন্যাকে ভাল-বাসে তাহা দেখিয়াছি, এ সকল প্রেমের সঙ্গে তোমার প্রেমের তুলনা হয় না। তোমার প্রেম যে মারে গালাগালি দেয় খেতে দেয় না তাহাকেই ভাল বাসে। তোমার প্রেম লইয়া গৌর নিতাই জগাই মাধাইকে ভাল বাসিলেন। ঈশা বুকের রক্ত দিয়া শত্রুর মঙ্গলসাধন করিলেন।

৯ বৈশাখ শনিবার—হে হরি, আমাদের বয়সের উপযুক্ত ধর্ম্ম দেও। আমরা বৃদ্ধ হয়ে দুর্ব্বল রুগ্ন হয়েছি, এই রুগ্নাবস্থায় যাহা সাধন করিতে পারি সেই ধর্ম্ম দেও।

১০ বৈশাখ রবিবার—হে ঈশ্বর যখন প্রথম সৃষ্টি করিলে, তখন কি ভোগ করিবার কেহ ছিল? ধান্য দেও, অন্ন দেও, ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যায়, ইহা বলিয়া কি কেহ প্রার্থনা করিত? তৃষ্ণায় প্রাণ যায় এই বলে কাঁন্দিল, তার পর কি তুমি নদীর সৃষ্টি করিয়াছ? না। তুমি আগে থেকে জান, মানুষের অন্ন জলের প্রয়োজন হইবে, তাই তুমি এ সকলের সৃষ্টি করিয়াছ। সেইরূপ ধর্ম্ম পুণ্য প্রেম এ সকল মানুষের প্রয়োজনে লাগিবে, তাই তুমি মানুষ সৃষ্টির আগে ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলে।

নববিধানের ভাব সাধন।

১১ বৈশাখ (২৩ এপ্রেল) সোমবার আচার্য্য সিমলা পর্ব্বতে গমন করেন। বৈশাখমাসের প্রথম দিনে যে চারিটি ব্রত প্রদত্ত হয় তন্মধ্যে উদারতাব্রতের নিয়ম এই;—"সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে।

কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা মুষা প্রভৃতি তোমাদের প্রতি নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা মুষা শাক্য গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্তভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভার প্রাপ্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেব দেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিত দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণ-ধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে।”

প্রেরিত কালীশঙ্কর বিধির অনুসরণে একান্ত তৎপর ছিলেন। তাঁহার নিকটে কোন বিধি মৃত ছিল না, উহাকে জীবনের শোণিত ও অন্নপান যত ক্ষণ করিতে না পারিতেন,তত ক্ষণ তাঁহার প্রযত্নের বিরাম ছিল না। “এক এক ভিন্নভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন।” এ কথা শুনিয়া

তিনি নিস্তব্ধ থাকিবার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ভিতরে শাক্য ও গৌরাঙ্গের ভাব যুগপৎ স্থিতি করিতেছে। সুতরাং এই দুই মহাজনকে ভাবে এক করিয়া আপনার ভিতরে গ্রহণ করিবার যত্ন তাঁহাতে উপস্থিত হইল। তিনি কিরূপে এ দুজনকে এক করিয়া লইলেন, তাঁহার নিজের কথায় তাহা প্রদর্শন না করিলে তাঁহার মনের ভাব কেহ বুঝিতে পারিবেন না, এ জন্য এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ গৌতম ও গৌরাঙ্গের অসম্মিলন তিনি এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন:—

"শাক্যসিংহ সম্রাট্‌পুত্র, গৌরাঙ্গ গরিব ব্রাহ্মণপুত্র। শাক্য মুনির জীবন চেষ্টাসম্ভূত ও বীরত্ববিজৃম্ভিত, গৌরাঙ্গের জীবন অযত্নসম্ভূত আনুগত্যবিজৃম্ভিত। গৌতম জ্ঞানী, গৌর ভাবুক, গৌতম চিন্তাশীল, গৌর চিন্তাশূন্য সদানন্দ। গৌতম বিধিবিহিত প্রণালীর অনুসরণ করেন, গৌরাঙ্গ বৈধাবৈধবিচারশূন্য হইয়া ধর্ম্মপথে চলিয়াছেন। গৌতম সাধনসিদ্ধ গৌরাঙ্গ স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল বৈষম্যভাবই সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও অসম্মিলনের কারণ। গৌতম-প্রদর্শিত নির্ব্বাণপথাবলম্বী ভিক্ষু বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, অথবা বৈষ্ণব বৌদ্ধদিগকে নাস্তিকতার অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে যে কোন কালে সম্মিলন হইবে তাহার আশা করা যায় না, কিন্তু নববিধান বলিতেছেন, এ বিসংবাদ আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে না, এখন সম্মিলন ও সদ্ভাব বিস্তার হইবে। সুতরাং গৌতমের সঙ্গে গৌরাঙ্গের যে বিবাদ তাহা দূর করিয়া তাঁহাদিগের ভিতরে সম্মিলন ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে হইবে।"

তিনি উভয়ের মধ্যে সম্মিলনের ভূমি এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন :—"গৌতম সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গও সন্ন্যাসী, সুতরাং গৌতম ও গৌর দুইজনই বৈরাগ্যপ্রিয়। গৌতম ধ্যানেতে ব্রহ্মে * স্থিতি করেন, গৌরাঙ্গ প্রেমেতে ঈশ্বরসহবাস অনুভব করেন, প্রকারগত ভেদ হইলেও দুইই এক দিকে সমান। গৌতম বৃদ্ধ পিতা মাতা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও প্রিয়তম পুত্র পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গও বৃদ্ধা জননী প্রিয়তমা পত্নী বিদ্যাবুদ্ধি মান সম্ভ্রম সকল বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। গৌতম নির্ব্বাণ সাধন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাগ দ্বেষাদি তরঙ্গবর্জ্জিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ হরিভক্তির বলে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে একেবারে হরিতে উৎসর্গ করিয়া আপনার বলিয়া আর কিছুমাত্র রাখেন নাই, হরিপ্রেমের আকর্ষণে তাঁহার রাগ দ্বেষাদির বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। এই সকল সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, গৌতম ও গৌরাঙ্গের বস্তুতঃ কোন বিসংবাদ নাই।......বিশ্বাস, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, জীবিকা ও জীবন উদ্দেশ্য, প্রত্যাদেশ, সাধন, সিদ্ধি, রুচি, শীলতা, পুণ্য, উদারতা ইত্যাদি বিষয় লইয়া আমরা গৌতমের জীবনের সঙ্গে গৌরাঙ্গের জীবনের কিরূপ সম্বন্ধ ও সম্মিলন তাহা প্রদর্শন করিতেছি।"

---

* 'ইমং পুনর্জ্জনতা প্রসন্ন ব্রহ্ম তেন অধিঃ প্রবর্ত্তয়ি চক্রম্' এই এই অংশের অর্থ সোসাইটির মুদ্রিত গ্রন্থে যেরূপ আছে তাহা দেখিয়া 'ব্রহ্মে স্থিতি' লিখিত হইয়াছে। এ অংশের ভ্রম দেখিয়া পরে যে শোধন হয়, তাহাতে 'ব্রহ্মে' না হউক 'অনন্ত জ্ঞানে' স্থিতি সিদ্ধ হওয়াতেই মূল সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ যে বিশ্বাসে এক তাহা প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রথমতঃ গৌতমের বিশ্বাসবিষয়ে লিখিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন :—"যাহা অন্ধকার প্রতিকূলতার ভিতরে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতে দেয় না, প্রত্যুত অতি দুষ্করকার্য্যসাধনে আলোক ও বল দিয়া অগ্রসর করে, এবং প্রাণের গভীর স্থানে আশার সংবাদ প্রচার করে তাহাকে বলা যায় বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি, শাক্যমুনি নিমাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসে এক। তাঁহারা উভয়ে একই ভূমিতে দণ্ডায়মান, একই গৃহে গৃহস্থ, একই অন্নপানে জীবিত, একই শয্যায় শায়িত, একই পরিচ্ছদপরিহিত ছিলেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে উভয়ের জীবনের গতি এক দিকে, স্ফূর্ত্তি, তেজ ও সৌন্দর্য্য সমুদায় একই বিষয় বা বস্তু লইয়া। সেই বস্তু কি? ব্রহ্ম। কেহ কেহ এ কথাতে আপত্তি করিবেন। তাঁহারা বলিবেন এ কথা সত্য নহে, কেন না গৌতম নাস্তিক বলিয়া জগতের নিকটে পরিচিত, গৌরাঙ্গ একেবারে তাহার বিপরীত পৌত্তলিক বা নরপূজক। এক জন নাস্তিকের সঙ্গে এক জন নরপূজকের যে কোন ক্রমেই সম্মিলন হইতে পারে না, এ কথাটী নিতান্ত অজ্ঞ লোকেরাও বুঝিতে পারে। এই কথার উত্তরে আমরা বলি, গৌতমকে যাঁহারা নাস্তিক বলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি নাই, আবার গৌরাঙ্গকে যাঁহারা নরপূজক পৌত্তলিক বলেন তাঁহারা গৌরাঙ্গকে চিনিয়াছেন বোধ হয় না। যে নাস্তিক সে তপস্যা করিল কেন? ইন্দ্রিয় শোষণ করিল কেন? ইন্দ্রিয় জয় করিয়া নির্ব্বাণ সাধন করিল কেন? যে নাস্তিক তাহারতো ভবিষ্যচ্চিন্তা নাই, পরলোকের চিন্তা নাই। যাহার পরলোক নাই ইহলোকই

সর্ব্বস্ব, সে নির্ব্বাণ সাধন করিয়া, পার্থিব সৌভাগ্যের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবন যাপন করিবে কেন ? যিনি পরলোক জানেন না, পরলোক মানেন না, তাঁহার তাদৃশ কঠোর ব্রতপালনজনিত দুঃখ বহন করিয়া কাজ কি? অতএব বিশ্বাস করা প্রয়োজন হইতেছে যে শাক্যমুনি নাস্তিক নহেন, কিন্তু আস্তিকচূড়ামণি ছিলেন। ...... শাক্যের বিশ্বাসবিষয়ে আমরা তাঁহার জীবনের প্রণালী ধরিয়া চলিলে আরও উচ্চে উঠিতে পারি, ও অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ লইতে পারি। শাক্য বাল্যকাল হইতে পরিবর্ত্তনশীল মানবজীবনের সুখ দুঃখাদির বৈষম্য দূর করিয়া এক অপরিবর্ত্তনীয় সুখে উত্থিত হইবার জন্য লালসা প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এই উচ্ছ্বাসের প্রতিকূলে কত শত সহস্র বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেই গতির অবরোধ করিতে পারে নাই। বিশ্বাসের বল ব্যতীত কেহ এইরূপে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারেন না। 'অন্ধকারে বস্তু আছে' এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস না থাকিলে যেমন কেহ বস্তুর অন্বেষণ করিতে অন্ধকারে প্রবেশ করে না, সেইরূপ পরে নিশ্চিত অপরিবর্ত্তনীয় সুখ আছে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কেহ পরিবর্ত্তন হইতে অপরিবর্ত্তনে উত্থিত হইতে চেষ্টা করিতে চাহে না। এই যে গতি ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত শাক্যমুনির জীবনে অক্ষুন্ন ছিল। এই গতি তাঁহাকে পতিব্রতা পত্নীর প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, পিতামাতার প্রগাঢ় স্নেহ পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, রাজ্য ও রাজপদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কার হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল, ভোগ বাসনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। তাহা কি অন্ধকারাবৃত

শক্তিহীন চেষ্টা? কখনই নহে। কেহ বলিবেন, এইরূপ হইলে শাক্য যে দেবতার উপাসনা করিতেন তাহার ভাব, নাম শক্তি প্রভৃতির কথা বলিতেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে কোন স্থানে তাহা পাওয়া যায় না, বরং দেব দেবীর প্রতিকূলেই অনেক কথা বলিয়াছেন। ... ... শাক্যমুনি কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত দেবতার উপাসক ছিলেন না ইহা সত্য, কিন্তু তিনি যে এক নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প অতীন্দ্রিয় বরণীয় দেবতার অর্চ্চনা করিতেন ইহাও অতীব সত্য। ... ... তিনি বিবাদাস্পদ ঈশ্বর পরিত্যাগ করিয়া নাম রূপগুণ বর্জ্জিত বাক্যের অবিষয়ীভূত সদ্বস্তুর প্রতি চিত্ত সমাহিত করিয়াছিলেন।"

তিনি এই অংশ এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন:—"আমরা শাক্যমুনির জীবন পর্য্যালোচন করিয়া তাঁহার জীবনের ভিতরে এমন এক অলৌকিক তেজ আলোক ও শক্তি দেখিতে পাই যাহা কোন কারণে পরাজিত হয় নাই। শাক্যমুনির সময়ে যত বড়লোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যত পণ্ডিত বিদ্বান্ লোক তৎকালে জীবিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শাক্যের শক্তির নিকট অবনত ছিলেন। এই তেজ আলোক ও শক্তির নামান্তর বিশ্বাস। বিশ্বাস মনুষ্যকে উষ্ণ রাখে, শীতল হইতে দেয় না, আলোকিত করিয়া গুপ্তস্থান নিহিত সত্যরত্ন সকল দেখাইয়া দেয়, বলের সহিত বাধা বিঘ্ন প্রতিকূলতা সকল অতিক্রম করিয়া চালিত করে। বিশ্বাসের এই তিন শক্তি শাক্যমুনির জীবনে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। শাক্য আপন জীবনে যে প্রকার অপ্রতিহত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেবল এক বিশ্বাসেই শোভা পায় অন্য কিছুতে নহে।"

"অন্ধকার প্রতিকূল ঘটনা বিশ্বাসকে ভীত বা সঙ্কুচিত করিতে পারে না, প্রত্যুত দুষ্কর কার্য্যসাধনে আলোক ও বল দিয়া অগ্রসর করিয়া দেয়," এই মূল সূত্র ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনের বৃত্তান্ত দ্বারা তিনি তাঁহার বিশ্বাস অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণিত করিয়াছেন। যে শক্তির দ্বারা 'এইটি সৎ, এইটি অসৎ,' এইরূপ বস্তু নির্ব্বাচিত হয় তাহাকে জ্ঞান বলে। এই লক্ষণাবলম্বন করিয়া গৌতমের জীবনে জ্ঞানের যে কি সুমহৎ ঔজ্জ্বল্য ছিল তাহা তিনি বিস্তৃত ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের জ্ঞানের বিষয় বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "যখন যে মহাপুরুষ জগতে অভ্যুদিত হন, তিনি তৎকালোচিত সমুদায় প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পূর্ণরূপে সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হন, কেন না আয়োজনের অভাব হইলে প্রয়োজন অসিদ্ধ থাকিবে। তৎকালে প্রেমের প্রয়োজন অধিক ছিল, সুতরাং গৌরাঙ্গের জীবনে প্রেমের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে সুন্দর করিয়াছিল। তাই বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল না এরূপ হইতে পারে না। তৎকালে যত জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তাহা সম্পূর্ণ তাঁহাতে ছিল। প্রেমের সঙ্গে জ্ঞান প্রেমের সাহায্য করিবার জন্য। প্রেমকে সপ্রমাণ করিবার জন্য যত জ্ঞান প্রয়োজনীয়, যত জ্ঞান হইলে প্রেমের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, তত জ্ঞান গৌরাঙ্গের ছিল, অভাব ছিল না।" জ্ঞানের অভাব ছিল না এইটি দেখাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যের জীবন হইতে ন্যায় শাস্ত্রের টীকা রচনা ও তাঁহার সেই টীকা বিদ্যমান থাকিলে অপর এক জনের রচিত টীকা লোকে আদৃত হইবে না, ইহা জানিতে পাইয়া তাহা জলে বিসর্জ্জন, দিগ্বিজয়ীর পরাভব, তাঁহার ব্যাখ্যানকৌশলে ষড়্‌দর্শনবেত্তা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের

শিষ্যত্বস্বীকার, ইত্যাদি বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন।

গৌতমে ভক্তি ছিল, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন :—"গৌতমের ভক্তি? এ যে নূতন কথা। নববিধানের প্রসাদে সমুদায় নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে। সেই জন্য গৌরাঙ্গের জ্ঞান গৌতমের ভক্তি এই সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। গৌতমের ভক্তি অপ্রসিদ্ধ কথা, কেহ জানে না, কেহ কখন শোনে নাই। নববিধানের প্রসাদে সেই অপ্রসিদ্ধ কথা প্রসিদ্ধ হইবে, এই জন্য আমাদের চেষ্টা ও শাক্যমুনির জীবনে যে সকল ভক্তির লক্ষণ ছিল তাহা প্রদর্শন করিতেছি। এ বিষয় বুঝিতে হইলে অগ্রে জানা আবশ্যক, 'ভক্তি কি'? ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ এই, কেবল সেই একমাত্র ইষ্টদেবতার প্রতি—এক মাত্র লক্ষ্যসাধনের প্রতি অনুরক্তি, অন্যবস্তু বা ব্যক্তির প্রতি নিরভিলাষিতা, জ্ঞান অর্থাৎ মতামত বিষয়ে শুষ্ক তার্কিকতা এবং কর্ম্ম অর্থাৎ পশুবধপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত যে অনুষ্ঠান তাহা দ্বারা আবৃত না হওয়া এবং প্রিয়ভাবে ইষ্ট বস্তুর অনুশীলনকে ভক্তি বলা যায়।" এই লক্ষণটি যে শাক্যমুনির জীবনে ছিল, তাহা দেখাইয়া ভক্তির যে সকল ফল নির্ণীত আছে সেই সকল ফল তাঁহার জীবনে পূর্ণতালাভ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক এই কথা গুলিতে উপসংহার করিয়াছেন :—"ভক্তিতে হৃদয় কোমল হয়, জ্ঞানে কঠিন হয়। গৌতমের জ্ঞানপ্রধান হৃদয় অত্যন্ত কোমল মৃদু ও দয়ালু ছিল, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের সহচরী ভক্তি ছিল, ইহা বলাতে দোষ বোধ হয় না। ফলতঃ যে গুণ থাকাতে অথবা যে দেবশক্তি

আসিয়া মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে, মানুষকে ব্যস্ত করিয়া তোলে, পূর্ব্বভাবে আর সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সেই দৈবশক্তি ভক্তি গৌতমের ছিল। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, চৈতন্যের জীবনে যেমন ভক্তির পূর্ণতা ছিল, গৌতমের জীবনে সেরূপ ছিল না, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনী শক্তি অবশ্যই ছিল, যাহাতে জীবনকে সহজে সহসা পরিবর্ত্তিত করে। চৈতন্যের জীবনে যেমন জ্ঞান ছিল কিন্তু গৌতমের জ্ঞানের ন্যায় তীব্রজ্ঞান ছিল না গৌতমের জীবনেও সেইরূপ ভক্তি ছিল, কিন্তু তাহার তাদৃশ তীব্রতা ছিল না। 'তীব্রতা ছিল না' ইহার অর্থ ইহা নয় যে অভাব ছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার শক্তি প্রকাশ পাইত না এইমাত্র। চৈতন্যের জীবনে ভক্তি যেমন তরঙ্গায়িত নদীজলের ন্যায় বিলাসময়ী উল্লাস ও উচ্ছ্বাস পূর্ণা ছিল, শাক্যের জীবনে ভক্তির তেমন লীলাবিলাসাদি ছিল না। যা হউক, শাক্যের জীবন ভাবময় ছিল। তিনি ধ্যান করিতেন সত্য, কিন্তু যে জীবন ভাববিহীন তাহা ধ্যান করিতে পটু নহে। ধ্যানের ভিতরে রস চাই, মাধুর্য্য চাই, যাহাতে তৃপ্তি জন্মে, আনন্দ জন্মে, এমন কিছু চাই। রস না পাইলে সুখ না পাইলে একান্তভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে কেন? এস্থলে একটি বৈজ্ঞা-নিক সত্য মনে পড়িতেছে। জ্ঞান বল, ভক্তি বল, কর্ম্ম বল, পরস্পরের পোষণ শক্তি আছে। যে স্থলে জ্ঞান আছে সেস্থলে সেই জ্ঞানের পোষণার্থ ভক্তিকর্ম্মও কিছু না কিছু থাকিবেই। ভক্তি থাকিলেও কিছু না কিছু জ্ঞান ভক্তি থাকিবেই। অতএব একটী প্রধান শক্তি থাকিলে সেই শক্তির পোষণজন্য অন্য শক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমন 'দ্রব্যমেকরসং নাস্তি ন রোগোঽ

প্যোকদোষজঃ।' কোন দ্রব্য যেমন কেবল তিক্ত, কটু বা মধুর হয় না, রোগ যেমন একটিমাত্র দোষ হইতে জন্মে না, সেইরূপ কোন মনুষ্যেতে কেবল ভক্তি কি কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম্ম প্রভৃতি থাকিতে পারে না।"

গৌরাঙ্গের ভক্তিসম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তাঁহার লেখনী যে অবিরল ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিবে, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না, "গৌতম ও গৌরাঙ্গ" প্রবন্ধ আজও স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয় নাই, ১৮০৫ শকের ধর্ম্মতত্ত্বে উহা প্রবন্ধকারে প্রকাশিত রহিয়াছে। কি ভাবে গৌরাঙ্গের ভক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য আরম্ভের গুটী কয়েক কথা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"গৌরাঙ্গের ভক্তি, না ভক্তির গৌরাঙ্গ কি বলিব? কি বলিলে তাঁহার গৌরব রক্ষা পাইবে তাহাতো জানি না। না জানিয়া কথা বলিলে যদি তাঁহার অবমাননা করা হয়, তবে তো আমাদের অপরাধ হইবে। বস্তুতঃ সাধুমুখে শুনিয়াছি গৌরাঙ্গের ভক্তি নহে কিন্তু ভক্তির গৌরাঙ্গ। ভক্তিরূপ উপাদান লইয়া গৌরাঙ্গমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া যেমন ঘট প্রস্তুত করে, সেইরূপ ভক্তির মৃত্তিকা দ্বারা গৌরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ কেন? ভক্তি নির্ম্মিত এই জন্য। ভক্তের বর্ণ গৌর, কেন না ভক্তিতে পাপ (কৃষ্ণবর্ণ) ভাববৈরস্য প্রভৃতি মালিন্য নাই। ভক্তি অতি শুভ্র অতিজ্যোতিঃপূর্ণ। জ্যোতিঃপূর্ণ ভক্তি যাহার উপাদান, তাহা কাজেই গৌরাঙ্গ না হইয়া আর কি হইবে? গৌরাঙ্গ সুন্দর। গৌরাঙ্গের এত সৌন্দর্য্য কিসের? তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী, সুন্দর গঠন প্রণালী, সুন্দর দেহকান্তি যে অবলোকন করিত, সে

আর চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। এ সকল কথা কল্পিত নহে, ইহা বহু কাল হইতে জগতে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে একবার গৌরাঙ্গমূর্ত্তি, সেই মহিমান্বিত ভাবময় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিত, সে আত্মবশে থাকিতে পারিত না। সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেমন দংশনমাত্র কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলশায়ী হয়, গৌরাঙ্গ-দর্শনে সেইরূপ হইত। গৌরাঙ্গের জীবন জলন্ত অগ্নির ন্যায় দহনশীল এবং নদীসলিলের ন্যায় তরঙ্গময়। ইহার ভিতরে পড়িলে পতঙ্গের ন্যায় ভস্মসাৎ হইতে হইত, অথবা নদীতরঙ্গে পতিতের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে হইত। এরূপ হইত কেন কে জানে? ......"

গৌরাঙ্গের প্রগল্‌ভা ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক চরমে গৌতমের সহিত গৌরাঙ্গের ঐক্য এই কয়েক পংক্তিতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে,—"গৌরাঙ্গের রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি ভক্তির, গৌরাঙ্গের সেই পবিত্র রক্ত কেবল প্রেম ও পুণ্য মাখা ছিল। যখন প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিত, রোমকূপ হইতে ভাবময় রক্তোদ্গম হইত; কদম্বকুসুমের ন্যায় রোম সকল কণ্টকিত হইত; হস্ত পদের সন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িত, দেখিয়া বোধ হইত গৌরাঙ্গ জীবিত নাই। গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন? না, আবার সেই ভক্তি সেই প্রেমের সঞ্জীবনী শক্তি দৈবশক্তি আসিয়া শ্লথ সন্ধি সকল একত্র করিয়া দিত, মূর্চ্ছাবিকার দূর করিত। তাঁহার চিন্তা প্রেমের, কথা প্রেমের, কার্য্য প্রেমের, নিদ্রা যাইতেন প্রেমে, আহার করিতেন প্রেমে, প্রেম ব্যতীত তাঁহার জীবনে অন্য কিছু দেখা যাইত না। মদ্যপায়ী লোকেরা যেমন সর্ব্বদা আত্মহারা হইয়া থাকে, কি

কথা বলে, কি কার্য্য করে, কি আহার করে পান করে, কার সঙ্গে আলাপ করে, তাহার কিছু সে আপনি জানে না; গৌরাঙ্গ সেই রূপ পরবশ ছিলেন। তিনি কি বলিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, কার সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, কিসের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহা যেন তিনি জানিতেছেন না, বাহিরের লোকেরা এইরূপ মনে করিত। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন চির জাগ্রৎ চির জীবন্ত ছিল। অদ্যাপি সেই তেজ সেই বীর্য্য মানব-হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মহামুনি শাক্যও এইরূপ চিন্তাতরঙ্গে পড়িয়া ডুবিতেন উঠিতেন, ভাসিয়া বেড়াইতেন, এ দিগে ও দিগে নড়িয়া সরিয়া অন্য কোথাও যাইবার উপায় ছিল না। ভক্তিতে গৌতম নহে গৌরাঙ্গ প্রসিদ্ধ। আমরা বলি যে শক্তিতে বল-পূর্ব্বক মনুষ্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখে এবং বলপূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি, কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণ এবং স্বার্থ অহঙ্কার অভিমান প্রভৃতিকে বিনাশ করে, সেই শক্তিকে আমরা ভক্তি বলি, সুতরাং নির্ব্বাণ আর ভক্তি কার্য্যতঃ একই হইতেছে। নির্ব্বাণ মনুষ্যকে আমিত্ববর্জ্জিত করে, নিরহঙ্কৃত করে, ভক্তিও তাই করে? এ স্থলে নামে একতা না থাকিলেও ফলে একই দাঁড়াইতেছে। আমরা ফল চাই কিন্তু অনুষ্ঠান আয়োজন চাই না। সুতরাং গৌতমও গৌরাঙ্গের পরস্পরের অনৈক্য বিসংবাদ নাই, প্রত্যুত ঐক্য ও সম্মিলন আছে।"

কেশবচন্দ্র ভগ্নমনে দল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সিমলায় গমন করিলেন। নববর্ষে প্রেরিতগণের প্রতি যে ব্রতবিধি ঘোষিত হইল, তাহা তাঁহাদের কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইল, বৈরাগ্য, প্রেম, ঔদার্য্য ও পবিত্রতার ব্রত অগ্রাহ্য করিয়া সকলে স্বেচ্ছা-

প্রণোদিত ভাবে চলিতে লাগিলেন, ইহাতে আচার্য্যের হৃদয় ঘোরতর আহত হইল। প্রেরিত কালীশঙ্কর ১৭ আষাঢ় তাঁহার নিকট হইতে যে পত্র প্রাপ্ত হন, উহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। মনে হয়, এই পত্রে কে কে ব্রতগ্রহণে প্রস্তুত আচার্য্য তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অন্যথা তৎপর দিন তাঁহার পত্রের ইনি যে উত্তর দেন, তাহাতে গৌতম ও গৌরাঙ্গের সাধনবিষয়ে কেন তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিবেন। ১৮ আষাঢ়ের দৈনন্দিন লিপিতে লিখিত আছে,"পূজনীয় আচার্য্যের পত্রের উত্তর। জিজ্ঞাসা গৌতম ও গৌরাঙ্গের সাধন।" প্রেরিত কালীশঙ্কর ২৫ ও ৩২ আষাঢ় এবং ৭, ১৪ ও ২৮ শ্রাবণ আচার্য্যকে পত্র লিখেন। মনে হয়, আচার্য্যের পীড়াবৃদ্ধির সংবাদশ্রবণ করিয়া ৩২ আষাঢ়ের পত্রে চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধপত্র পাইয়াই তিনি হয়তো ১৯ জুলাই (৪ শ্রাবণ) প্রেরিত কালীশঙ্করকে নিম্নলিখিত হৃদয়ের গভীর ক্লেশব্যঞ্জক এই পত্র লিখিয়াছিলেন :—

"হিমালয় ১৯ জুলাই ১৮৮৩।

"শুভাশীর্ব্বাদ,

'ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।' সে এক ভাব আর এ এক ভাব। কলিকাতার কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাউক আছে কি না। থাকিলেই আমি টানে পড়িব। যদি না থাকে সর্ব্বনাশ। মনে হইল যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি! বলে কাপড় দেও, টাকা দেও, মান দেও, উচ্চপদ দেও, বাহবা দেও, বাহাদুর উপাধি দেও, অর্থাৎ বিষ্ঠা দেও, আমি দিতে পারি না। দিব না। এইজন্য আমাকে কলিকাতায়

যাইতে বল ? কোটি টাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি। এখন মরলা। কি লজ্জার কথা।

সেবক শ্রীকে"

৭ শ্রাবণ প্রেরিত কালীশঙ্কর কেশবচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তাহা সম্ভবতঃ এই পত্রেরই উত্তর। কেশবচন্দ্র আপনার প্রাণের গভীর বেদনা আর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া প্রেরিত কালীশঙ্করের নিকটে কেন প্রকাশ করিলেন ? অবশ্যই ইহার ভিতরে এমন কোন ভাব দেখিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি আশা করিতেন ইহার জীবনে বৈরাগ্যাদি বিধি প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার হৃদয়বেদনার কথঞ্চিৎ প্রশম হইবে। যিনি নাট্যাভিনয়ের সময়ে (১৮০৪, ভাদ্র) মানসম্ভ্রমাদি দূরে পরিহারপূর্ব্বক * পরিণতবয়স্ক হইয়াও হাস্যোদ্দীপক সাজে সাজিয়া নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন এবং যিনি তন্মধ্যে আচার্য্য যেমন তেমনি পরিত্রাণের ব্যাপার দেখিয়া এই সঙ্গীতটি গাইয়াছিলেন :—

"মা তোর প্রেমের আগুন জেলে।

তাহে পাপপুরুষকে পোড়াও ফেলে।

পোড়াইয়া পাপের গাদা, কাল হৃদয় কর সাদা, ঘুচে সকল বিঘ্ন বাধা, প্রাণের কালী গেলে।

বিনাশিয়ে মোহ কালী, বিবেকের প্রদীপ জ্বালি, হৃদয় গৃহ কর উজালি ; তাহে নববৃন্দাবন, তব নিত্য নিকেতন, দেখাও যথা ভক্তগণ, প্রেমের খেলা খেলে।

অবিনাশে যেমন করে, আনিলে মা নিজ ঘরে, রক্ষা করে

---

* "আমার মা হবে মজাজি" এই সঙ্গীতটি দেখাইয়া দেয় তিনি মানসম্ভ্রমাদি দূরে পরিহার করিয়া নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পাপবিকারে; তেমনি সকল সন্তানে, বাঁচাও প্রেমপুণ্যজলে অভয়চরণ পেলে।

কত শত পাপের দাগ, তার উপর বিষয়ানুরাগ, দিচ্ছে নূতন নূতন রং ঢেলে; ঘুচায়ে সংসারাসক্তি, দেও মাগো প্রেমভক্তি, হরিদাসে বাঁচাও ত্রাসে রাখি চরণতলে।"—

অপিচ যিনি গৌতম ও গৌরাঙ্গের সাধনসম্বন্ধে আচার্য্যকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি যে ব্রতবিধিপালনে কৃতসঙ্কল্প এ কথায় আচার্য্য বিশ্বাস করিবেন না কেন? যাহা হউক কেশব চন্দ্রের যে তৎপ্রতি শেষপর্য্যন্ত গভীর বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা আরও অনেক পাইয়াছি।

কার্ত্তিক মাসে আচার্য্য কেশবচন্দ্র ক্ষীণ জীর্ণ শরীরে নিজগৃহে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দর্শনে প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস শীতকালাতিক্রম হইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। তিনি যে রোগনির্ণয় করিলেন সে সময়ে চিকিৎসকগণ তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন না, কিন্তু পরিশেষে অসময়ে সেই রোগই প্রমাণিত হইল। প্রেরিত কালীশঙ্করের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু একাকী তাঁহার ভারগ্রহণ পরামর্শসিদ্ধ হইল না বলিয়া তাঁহাকে সে ইচ্ছা সংযত করিতে হইল। যে রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না, সে রোগের চিকিৎসার সম্যক্ দায়িত্বগ্রহণ তাঁহার পক্ষে কিছুতেই শ্রেয়স্কর ছিল না। কমলকুটীরের একটি অংশে প্রাত্যহিক উপাসনা হইত, উৎসবাদির সময়ে সমাগত উপাসকগণের সে গৃহে সমাবেশ হইত না, এজন্য কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র দেবালয় প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হন। যখন এই দেবালয়

প্রস্তুত হইতেছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই, তখন ৬টার সময়ে নূতন দেবালয়ে শঙ্খধ্বনিকরিবার জন্য প্রেরিতকালীশঙ্করের প্রতি আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে দরবার হইতে ভার হয়। তিনি প্রতিদিন প্রাতে নিয়মপূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। ১লা জানুয়ারী (১৮ পৌষ) নবদেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, ৮ জানুয়ারী (২৫ পৌষ) আচার্য্য নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। এই দিনের দৈনন্দিন লিপিতে এই কথা গুলি লিখিত আছে:—"এই দিনে আচার্য্যদেব মোহময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃতদেহ সংকার জন্য বেলা চারিটার সময় ৭ ৮ শত লোক প্রোসেশন করিয়া নিমতলায় গমন করেন। নিমতলায় লোকে লোকারণ্য। চন্দন কাষ্ঠ ধূনা গুগ্‌গুল ঘৃত দ্বারা চিতা সত্বর প্রস্তুত হইলে সংকারকার্য্য আরম্ভ হয়। আচার্য্যপুত্র করুণাচন্দ্র অন্যান্য প্রচারকগণ সহ যথারীতি স্তোত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিয়া পিতৃদেবের মৃত দেহ চিতাতে তুলিয়া দেন। বিলাপ শোক ও আর্ত্তনাদে ঘাট পূর্ণ হয়। কলিকাতার বড় বড় লোক প্রায় অনেকে এই কার্য্যে যোগদান করেন।" এ ঘটনাটীও ঐ দিনের দৈনন্দিন লিপিতে নিবদ্ধ রহিয়াছে:—"ভাই অমৃতলালের প্রস্তাবে আচার্য্যদেবের মৃত দেহ সকলে বেষ্টন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অদ্য হইতে আমাদিগের সকলের মধ্যে আচার্য্য যেমন পূর্ব্বে ছিলেন এখনও তেমনি থাকিবেন; তাঁহাকে উপস্থিত জানিয়া আমরা অন্য কোন নেতা মান্য করিব না এবং আমাদিগের যাহা কিছু কার্য্য হইবে দরবারের মতে হইবে, দরবার ভিন্ন কোন কার্য্য হইতে পারিবে না; এবং দরবারে সকলের একতায় কার্য্য হইবে, অধিকাংশের মতে হইবে না।"

১৭ মাঘের (৩০ জানুয়ারীর) দৈনন্দিন লিপিতে লিখিত আছে—"আমার উপাসনা। তুমি যদি বিবাদের লক্ষ্য হও, আর এই লইয়া আমরা বিবাদ করি, মানুষ বিরক্ত হয় না সুখী হয়। ছোট ছোট ছেলেরা মাকে বেষ্টন করিয়া যেরূপ আমার মা আমার মা বলিয়া বিবাদ করে সেইরূপ।" এই দিনে দেবালয়ে পালা-ক্রমে প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস উপাসনা করেন। এখনও প্রেরিত-গণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। নববর্ষের বিধি গ্রহণ না করাতে আচার্য্যের চিত্ত আহত ও ব্যথিত হইয়াছিল, সেই ব্যথানিবারণের জন্য প্রেরিতগণ নববর্ষের ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক ব্রতধারী হন, দরবারে এই প্রস্তাব উপস্থিত হয়। কেহ কেহ এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করাতে, উহা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। এই ঘটনায় অনেকে ভাবী বিরোধের সূত্রপাত অনুমান করিলেন। প্রেরিত কালীশঙ্কর তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন প্রধান। যখন তিনি বিরোধ অবশ্যম্ভাবী বুঝিলেন, তখন সেই বিরোধের লক্ষ্য যেন ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনভিন্ন আর কিছু না হয়, এ বিষয়ে তাঁহার মনের ভিতরে আন্দোলন চলিতেছিল। বিরোধ বিচ্ছেদে লোকের বিরক্তি উপস্থিত হইবে, অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে, এ চিন্তা তাঁহার মনে কেনই বা উপস্থিত হইবে না? লোকের বিরক্তি বা আপাত অশান্তির ভয়ে তাদৃশ বিরোধ হইতে নিবৃত্ত থাকা কখন শ্রেয়স্কর নহে, ইহা যখন বুঝিলেন তখন মনে হইল লোকে যদি বুঝিতে পারে, এ বিবাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনই লক্ষ্য, তখন তাহারা বিরক্ত না হইয়া বরং সুখীই হইবে, সুতরাং ঈশ্বরের জন্য বিরোধ করিতে পশ্চাৎপদ হইবার

কোন কারণ নাই। এই প্রার্থনার দ্বাদশদিনমধ্যেই বিক্ষোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ২৮ মাঘ (১০ ফেব্রুয়ারী) রবিবারের দৈনন্দিনলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন:—"মন্দিরে গিয়া দেখিলাম, প্রেরিত দরবার কর্তৃক যে স্বর্গীয় আচার্য্যের সম্মানার্থ বেদী শূন্য রাখা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দরবার হইতে কোন অনুমতি পাইবার অপেক্ষা না করিয়া নূতন বেদী তুলিয়া ফেলেন এবং পুরাতন বেদীতে উপবেশন করিয়াছেন, সুতরাং মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্যাংচুয়ারীতে বসিয়া কয়েকটি দুর্ব্বল প্রাণী একত্রিত উপাসনা করা হইল।" যাঁহাদিগের দরবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, এই ঘটনার পর হইতে তাঁহারা অধিবেশনে এমন সকল কথা বলিতে লাগিলেন, অন্য সময়ে এমন সকল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন, যাহাতে শান্তিতে এক গৃহে স্থিতির সম্ভাবনা নাই, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। দৈনন্দিনলিপিতে এ সকলের আভাস লিপিবদ্ধ আছে, প্রীতিকর বিষয় নয় বলিয়া আমরা সে সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর হইতে প্রেরিত কালীশঙ্করের জীবনে দিন দিন সাধনের তীব্রতা উপস্থিত হইল। ৩০ পৌষের (১৩ জানুয়ারীর) দৈনন্দিন লিপিতে "আদর্শচরিত্র" লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় এই দিন হইতে "আদর্শচরিত্র" সাধনে তিনি ব্রতী হন। এ সময়ে সাধনের স্রোত প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। দরবারে যাঁহারা স্থিতি করিলেন অল্প বিস্তর তাঁহারা সকলেই নিজ জীবনের দোষদুর্ব্বলতা-পরিহারের জন্য যত্নশীল হইলেন। ২০ ফাল্গুন রবিবার

আচার্য্যগ্রহণব্রত গৃহীত হয়। এই ব্রতে এই সকল নিয়ম ছিল :—

১। সোমবার—আত্মচিন্তা ও পাপ স্মরণ।

২। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি—অনুতাপ ও পাপ স্বীকার।

৩। শুক্রবার—রিপুসংহার ব্রত।

৪। শনিবার—বৈরাগ্যব্রত।

৫। সোমবার—প্রেমব্রত।

৬। মঙ্গলবার—উদরতাব্রত।

৭। বুধবার—পুণ্যব্রত।

৮। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—সংহিতামত জীবন সাধন।

৯। সোম, মঙ্গল, বুধ—যোগ।

দৈনন্দিন লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সোমবার নহে শুক্র, শনি ও রবিবারে পাপচিন্তা পাপস্মরণ, তৎপর সোমবারে অনু-তাপ, মঙ্গলবারে রিপুসংহার ব্রত, বুধবার বৈরাগ্য ব্রত, বৃহস্পতি-বার প্রেমব্রত, শুক্রবার উদারতাব্রত, শনিবার পবিত্রতাব্রত, রবিবার জীবনবেদ পাঠ, সোমবার বৈদিক যোগ, মঙ্গলবার বৈদা-ন্তিক যোগ, বুধবার ভক্তিযোগ, বৃহস্পতি শুক্র শনিবার সংহিতা পাঠ, এবং এই দিনে ব্রত-উদ্‌যাপন হয়। 'নববিধানকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আগামী সোমবার হইতে কলিকাতার স্থানে স্থানে এক মাসের জন্য উপাসনাদি হয়' দরবারে এইরূপ নির্দ্ধারণ হয়। এই নির্দ্ধারণানুসারে কোথায় কোন্ দিন প্রচার হয়, তাহা দৈনন্দিন-লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি গোপনে গোপনে স্বয়ং ব্রত গ্রহণ করিতেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ দিনের দৈনন্দিনলিপিতে "কাননব্রতের" অনুরূপ একটি ব্রত তিনি

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি সাময়িক নিয়ম পরিত্যক্ত এবং অন্য কতকগুলি নূতন নিয়ম নিবিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং এ সকল যে জীবনে সাধন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যখন রোগ-শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ান ছিলেন, তখনও তাঁহার জীবনে এই ব্রতের কোন কোন বিধির কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি কেবল ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্বয়ং তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন। ব্রতটি এই :—

নিষেধ।

১। আলস্য।

২। দিবা নিদ্রা।

৩। রাত্রি জাগরণ।

৪। কুতর্ক।

৫। পরনিন্দা।

৬। ব্যর্থ প্রসঙ্গ।

৭। লঘুতা।

বিধি।

১। আদর্শস্মরণ।

২। জীবনবেদ পাঠ ও ধ্যান।

৩। আচার্য্যকৃত বক্তৃতা, উপদেশ ও প্রার্থনা পালাক্রমে পাঠ।

৪। প্রতিজ্ঞাপালনে সাধ্য মত যত্ন।

ক। আমি কোন বিষয়ে বড় এ অহঙ্কার মনে আসিতে দিব না।

খ। নারীসম্বন্ধে কোন কুচিন্তা মনে আসিতে দিব না।

গ। পরসুখে কাতর হইব না।

ঘ। আমার জিহ্বা ভ্রমে, আমোদে বা অসাবধানতায় মিথ্যা বলিবেক না।

ঙ। শক্ত কথা বলিয়া কাহারও মনে পীড়া দিব না।

চ। বাক্যেতে ও কার্য্যেতে অনুগত দাসের ন্যায় থাকিব।

ছ। ভ্রাতাদিগের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদের জন্য ব্যাকুল হইব।

জ। নিজের মঙ্গল, সাধুসেবা ও জগতের হিত সাধন জন্য উপযুক্ত পরিশ্রম না করিয়া ঈশ্বরের ভাণ্ডার হইতে ধান্য লইব না।

৫। দেশে বিদেশে ২০ খানা পত্র লেখা বা সাক্ষাৎ আলাপ।

৬। সৎপ্রসঙ্গ।

'কাননব্রত' মধ্যে যে সকল নিষেধ বিধি আছে, তাহার প্রথমটি ও অষ্টমটি তৎকালসমুচিত ছিল বলিয়া সে দুইটি এবং উপবাস পরিত্যক্ত এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যর্থ প্রসঙ্গ ও লঘুতা নিষেধবিধিমধ্যে নূতন গৃহীত হইয়াছে। বিধিমধ্যে তৎকাল সমুচিত যে কয়েকটি বিধি ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ নূতন বিধি গৃহীত এবং ৫ম বিধিটি পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রেরিত কালীশঙ্করের প্রচারব্রতাবলম্বনকরিবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (১৭৯৮, ২ আষাঢ়) যে বিধি স্থাপিত হইয়াছিল, সেইটিকে আপনার জীবনের উপযোগী করিয়া লইয়া সাধনকরা এই দেখাইয়া দেয় যে, তিনি বিধানের পূর্ব্বাপর সমুদায় বিধিগুলিকে সমান মান্য করিতেন, এবং যে বিধিগুলি জীবনগঠনের উপযোগী সেই

গুলি সাদরে সাধনার্থ গ্রহণ করিতেন। বিধিগ্রহণে তাঁহার কোন প্রকার অন্ধতা ছিল না। যদি অন্ধতা থাকিবে, তাহা হইলে সময়োপযোগী করিয়া সেগুলিকে কখন পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তিনি লইতেন না। বিশেষ প্রেরণানুভব করিয়া যে তিনি ব্রত গ্রহণ করিতেন তাহার প্রমাণ এই যে, মণ্ডলীমধ্যে যে সময়ে সাধনের বায়ু বহিত, সেই সময়ে তিনি আপনার জীবনোপযোগী করিয়া বিধানগত ব্রতগুলির সাধন করিতেন।

এই ব্রতগ্রহণের পর পাঁচ দিনের দৈনন্দিনলিপিতে এই কথাগুলি লিখিত আছে:—১ আষাঢ়—"কেহ যদি সুখী হইতে চায়, সে আপনি মরুক, আপনি জীবিত থাকিতে আশা নাই।" ২ আষাঢ়—"পুণ্যের উপরে পাপের দাগ উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু পুঞ্জীকৃত পাপের ভিতরে মিলাইয়া যায়।" ৩ আষাঢ়—"আমি অনেক পরিশ্রম করিলাম কিন্তু ফল পাইলাম না, কেন না কেবল প্রণালীর দোষে সমুদায় বিফল হইল।" ৪ আষাঢ়—"সকল সংসার হরিব, হরি যদি আমার হন, আর কেউ পর থাকিতে পারিবে না।" ৫ আষাঢ়— "বস্ত্র পরিধানের তিন উদ্দেশ্য, লজ্জা রক্ষা, সৌন্দর্য্যসাধন ও ভদ্রতা। ধর্ম্মকে আমরা এই বস্ত্রের সঙ্গে তুলিত করিতে পারি। যখন পুণ্যবসন খসিয়া পড়ে তখন উলঙ্গ হয়, ধর্ম্মসাধনে তাহা দৃঢ় হয়। পাপে সুন্দর মুখ মলিন ও বিকৃত হয়, পুণ্যে বিকৃত মুখ সুন্দর হয়। ভদ্রতা রক্ষা ধর্ম্ম ভিন্ন হয় না। ধর্ম্মশূন্য লোক আর অভদ্র এক; ধার্ম্মিক হইলেই ভদ্র হইবে, ভাল মানুষ হইবে, মন্দ কর্ম্ম করিবে না।" ৬ আষাঢ় তিনি কেদার পুরে গমন করেন। সেখানে সঙ্কীর্ত্তন হয়। "হরি দাসের হরি নিকটে থাকিতে ভয় কি?" "আমি থাকিলে

তিনি থাকেন না তিনি থাকিলে আমি থাকিতে পারি না। এ বিবাদ কত দিনে মিটিবে?" "আমি যে এত অবাধ্য মা তাহা মনে রাখেন না। কেমন সুন্দর তাঁহার প্রকৃতি, ভাবিলেই মন পুলকিত হয়।" এগুলি হয়তো তিনি আপনি সেখানে যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহারই মূলবিষয়। ২৫ শে আষাঢ় হইতে অষ্টাদশ দিনের দৈনন্দিনলিপিতে এই কথাগুলি লিখিত আছে:—

"তুমি কার? তুমি কার যদি জানিতে পারি, তদনুসারে চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু ঠাকুর, তাহাতো তুমি কাহাকেও জানিতে দেও না, তুমি ব্রাহ্মণের তুমি চণ্ডালের, তুমি কাঙ্গালের তুমি ধনীর।"

২৬ শে আষাঢ়—"রাজা জীবিত থাকিতে রাজ্যে অমঙ্গল হয় না। মা ঘরে থাকিলে ভাই ভাই ভগিনী ভগিনী বিবাদ হয় না! আমরা রাজা নাই এমন রাজ্যে থাকি নাই, থাকিবও না। জননী নাই এমন ঘরে থাকিতে পারিব না।" "অনেক দিন হইল মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু তৃষ্ণাবোধ হইল না। যার তৃষ্ণা নাই তার আবার জল খাবার কি?"

২৭ শে আষাঢ়—"নানা রংএর ফুল আছে কিন্তু সব ফুল, সকল ফুলেই ভগবানের পূজা হয়। নানা বর্ণ হইলে ক্ষতি নাই কেবল ফুল হওয়া চাই, কেন না ফুল ভিন্ন তাঁর পূজা হয় না। আমরাও তবে পূজা করিব হৃদয় ফুল দিয়া। যত দিন হৃদয় ফুল হইবে না, তত দিন হরিপূজার যোগ্যতা বা অধিকার পাইবে না।"

২৮ শে আষাঢ়—"হরি তুমি কার? ধনী, মানী, জ্ঞানী, এত লোক দেখিলাম, কৈ কারু গৃহেতো তোমায় দেখ্‌তে পাই না।

গৃহস্থ যত্ন করে, কিন্তু তোমায় রাখ্‌তে পারে না কেন? তুমি কি হ'লে কি পেলে সর্ব্বদা থাক, তাই বল। আমি সেই উপায় কর্‌ব।"

২৯ শে আষাঢ়—"যে চায় না সে পায়, যে চায় সে পায় না। বিধাতার নিয়ম এইরূপ উল্টো।"

৩০ শে আষাঢ়—"ভাল স্থানে গেলেও ভাল হওয়া যায় না। ভালবাসার জন্য প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও যত্ন চাই।" "স্বর্ণের এত মূল্য কেন? অতি অল্প পাওয়া যায় এবং অল্পই অধিক ফলপ্রদ। সাধু সেইরূপ অধিক সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাতে অনেক ফল পাওয়া যায়। যেমন কহিনুরের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেইরূপ হরিভক্তের মূল্যও অধিক।"

৩১ শে আষাঢ়—"বিশ্বাসের বল সকল বল অপেক্ষা অধিক।"

১লা শ্রাবণ—"গন্ধের গুণে পীড়া ভাল হয় ও গন্ধের গুণেই সুস্থ শরীর পীড়িত হয়। এই জন্য অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রাহ্য। পীড়িত শরীর লইয়া যদি দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিতে হয়, তাহার ফল মৃত্যু অবশ্যই হস্তগত হইবে। আর চিকিৎসক যদি হন, তবে তিনি শীঘ্রই জলবায়ুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দেন।"

২রা শ্রাবণ—"অহঙ্কারের পরমাণু দিয়া মনুষ্যদেহের অস্থি সকল রচিত হইয়াছে। সে অস্থি দেহে থাকিতে ভগবতী তনুলাভের আশা নাই।" "প্রেম মঙ্গল আনয়ন করে, কিন্তু বিপদ্ আনয়ন করে না, সুতরাং প্রেমের পরিচ্ছদ লৌহনির্ম্মিত কিন্তু ভিতরে বড় সুন্দর সুরস ও সরল সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে।" "ভালবাসার মূর্ত্তি কর্কশ কোমল নহে, এই জন্য পৃথিবী তাহাকে নিতে পারে না। প্রকৃত প্রেম পীড়িত স্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া

যন্ত্রণা নিবারণ করে, মার মায়া তাহা নিষেধ করে। অনেক পরিশ্রম না করিলে যে নারিকেল ফলের স্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ অনেক কর্কশবস্তুতে আবৃত প্রেমিকের প্রেম সহজে দেখা যায় না।”

৩রা শ্রাবণ—“যে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতে হয় না, প্রকৃতি আপনি তাহাকে ভালবাসে, কিন্তু যে ভালবাসে না প্রত্যুত মন্দ বাসে, তাহাকে ভালবাসাইতো প্রকৃত মহত্ত্ব।”

৪ঠা শ্রাবণ—“আলোকের সঙ্গে পতঙ্গের যেমন সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সেইরূপ। দূর হইতে দেখিলে বেগে দৌড়িয়া গিয়া অগ্নিমধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করে। প্রথমতঃ অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না কিন্তু তবু সরিয়া পালায় না। এমন বেগে গিয়া পড়িয়া মরে যেন আর আত্মরক্ষার অধিকার না থাকে। হরিভক্ত ঠিক এইরূপ।”

৫ই শ্রাবণ—“প্রেমের অর্থ কি? প্রেমিক না হইলে বুঝিব না। মূর্খ লোকেরা বলে গঙ্গার বেগ যেমন ফেরে না, প্রেমের প্রবাহও ফিরে না। আমি বুঝি অপাত্রে যে প্রেম তাহা প্রেম নহে পশুত্ব। পশুত্ব আর প্রেম কখন এক বস্তু নহে। গঙ্গা যেমন সাগর ভিন্ন অন্য দিকে যায় না, প্রেমিক অনন্ত জীবনের মঙ্গল ভিন্ন আপনার কর্ত্তৃত্ব ডোবায় না।”

৬ই শ্রাবণ—“পথ আর পদচিহ্ন একই কথা। পূর্ব্বগামী লোকদিগের পদচিহ্নেরই নামান্তর পথ। পথ দেখিলে পদচিহ্ন দেখিলেই মনে হয় এখান দিয়া লোক যাতায়াত করে। পথ নিরাপদের আশা দেয়।”

৭ই শ্রাবণ—"স্বর্গেও সংসার আছে এ কথা সত্য নহে, কিন্তু সংসারাসক্ত লোকেরা যখন পুণ্যবলে স্বর্গে যায় তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সংসারও স্বর্গে যায়।"

৮ই শ্রাবণ—"কেহ আমার নিন্দা করিলে আমি কি করিব? আমি মনে করিব সে আপনার নিন্দা আপনি করিতেছে। কেন না এই প্রকার নিন্দাকারীদিগকে চিনিতে সংসারের বিলম্ব হয় না।"

৯ই শ্রাবণ—"বিশ্বাসের নিকট জ্ঞান প্রভুত্ব করিতে পারে না। কেন না বিশ্বাসই জ্ঞানের নিশ্চিত অবলম্বন।

১০ই শ্রাবণ—"লোকে প্রায়শঃ জিজ্ঞাসা করে 'কেমন আছ?' ইহার উত্তরে 'ভাল আছি' শুনিলেই নীরব হইতে হয়। এস্থলে জিজ্ঞাসু ও উত্তরদাতা উভয়েই প্রতারিত।"

১১ই শ্রাবণ—"ভজন সাধন জপ তপ যোগ ভক্তি সকলই অসার।"

এই অষ্টাদশ দিনের পর মধ্যে মধ্যে দৈনন্দিনলিপিতে তিনি আপনার মনের ভাব যে দিনে যাহা নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সেই সেই দিনের নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

২৭ শে শ্রাবণ—"যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে অসুর বা রাক্ষসদিগকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক, নতুবা তাহারা যজ্ঞের বিঘ্ন করে। আমরাও ব্রহ্মপূজা করিবার পূর্ব্বে পুরাতন জীবস্বরূপ পচামাংস অসুরের ভোজ্য করিয়া দি, নূতন জীবন লইয়া তাঁহার পূজা করি।"

২৮ শে শ্রাবণ—"পাপী হইয়াও ঈশ্বরকে দেখিতে পায় ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করে, কিন্তু পুণ্যবান্ ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে মিলন হয় না। পুণ্য দ্বারা আপন জীবনকে অভিষিক্ত না করিলে, কেহ

তাঁহার ভক্ত হইতে পারে না। যে কেহ বলে আমি তাঁহার, তাহার জীবন অন্যের হইবে কিরূপে?"

২৯ শে শ্রাবণ—"জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মালম্বকাঃ। বয়ন্তু হরিদাসানাং পাপত্রাণাবলম্বকাঃ।" (উদ্ধৃত)।

৩০ শে শ্রাবণ—"হরিভক্তের কোথাও ভয় নাই, কেন না স্বর্গ অপবর্গ ও নরক সর্ব্বত্রই তাঁহারা তুল্যরূপ দর্শন করেন।"

"তুমি নাকি খুব ভাল মেয়ে? কৈ, তোমার মুখেতে তাহার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না?

৩১ শে শ্রাবণ—"আমি না মরিলে আমার মঙ্গল হইবে না, এ কথাটার অর্থ কি বল দেখি?

৩২ শে শ্রাবণ—"শিশুতেই স্বর্গ শিশুতেই নরক স্ত্রীতেই স্বর্গ স্ত্রীতেই নরক। প্রকারান্তরে সংসারে স্বর্গ সংসারেই নরক যে বুঝিয়াছে, বুঝিয়া সাবধান হইয়াছে, সেই মানুষ।

১১ ভাদ্র—"আমি শুনিয়াছি, পুণ্য কোন কার্য্য বা অনুষ্ঠান নহে, পুণ্য কোন বাক্য বা পুস্তক পাঠ নহে, কিন্তু পুণ্য অগ্নি। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, পুণ্যেরও দাহিকা শক্তি আছে। মনুষ্যহৃদয়ে পুণ্য তেজ প্রবেশ করিলে তাহার কৃষ্ণত্ব দূর করিয়া উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিদান করে। এ সকল বাহিরের কার্য্য বাহিরেই থাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যে পুণ্য প্রাণমনকে শুদ্ধ করে না, সে আবার পুণ্য কেমন?

১২ ভাদ্র—"প্রকৃত বিশ্বাসের প্রমাণ কি? যে প্রভুর আজ্ঞায় পর্ব্বত হইতে পড়িতে, জলমগ্ন হইতে, অগ্নিপ্রবেশ করিতে সংকোচ করে না, সেই প্রকৃত বিশ্বাসী।"

১৩ ভাদ্র—"মন তুমি অনেক জ্ঞান সাধন কর সত্য কিন্তু

তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি যদি আপনার গতি কুপথ হইতে সম্পূর্ণ ফিরাইতে না পার, তোমার সমুদায় অলীক।"

১৪ ভাদ্র—"আমি যদি তাঁর হইতে পারি, নিশ্চয় তিনি আমার হইবেন। তিনি যদি আমার হন, কেউ আর পর থাকিতে পারিবে না।"

১৫ ভাদ্র—"দর্শন ভিন্ন সংশয় দূর হয় না, অতএব দর্শনের জন্য যত্ন করা আবশ্যক।

১৬ ভাদ্র—"প্রেমের শাসন পৃথিবীর শাসনের ন্যায় নহে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৭ ভাদ্র—"আমি এত কাল সাধু সঙ্গে রহিলাম, তবু সাধু হইতে পারিলাম না কেন? সাধুর সাধুতার মর্য্যাদা না জানাই ইহার কারণ।

১৮ ভাদ্র—"উষ্ণতা বাড়াও, উষ্ণতা কমাও। এক দিকের উষ্ণতা ভাল অন্যদিকের মন্দ।

১৩ আশ্বিন—"প্রীতি ও পুণ্য যদি স্বতন্ত্র হয় মহদনিষ্ট সম্ভাবনা।"

১৪ আশ্বিন—"সংসারকে অমৃতমাখা বিষ বলা যায়, কেন না ইহার স্বাদ মিষ্ট কিন্তু প্রাণসংহারক। যে ব্যক্তি এই অমৃত গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বাদ দিতে পারে সেই সুচতুর সংসারী।"

১৫ আশ্বিন—"কেউ যদি ধনী হইতে চাহে, সে বিশ্বাসী হউক। বিশ্বাস সকল সম্পদের মূল, সকল তত্ত্বের সার।"

১৬ আশ্বিন—"অবিশ্বাসীরা সত্য ঈশ্বরকে অসত্য বলে, অসত্য অহঙ্কারকে সত্য বলে।

১৭ আশ্বিন—"যেমন যজ্ঞগৃহে কুকুর প্রবিষ্ট হইলে সমুদায় আয়োজন পণ্ড হয়, সেইরূপ বিশ্বাসীর দলে একটি অবিশ্বাসী প্রবিষ্ট হইয়া সকল আয়োজন বিনষ্ট করিয়া ফেলে।"

১৮ আশ্বিন—"যোগ না হইলে ভোগের আশা কমে না, যোগ হইলেও ভোগের আশা কমে না ; যোগ হইলেও ভোগের আশা কমে, যোগ না হইলেও ভোগের আশা কমে।"

১৯ আশ্বিন—সাধু ভক্তের রক্ত আমার হউক, সাধুর ভূতশুদ্ধি মনঃশুদ্ধি আমার হউক।"

২০ আশ্বিন—"হরি, আমি যে তোমায় ডাকি—কিছু পাইব বলিয়া অথবা কর্ত্তব্য বলিয়া নহে। শিশু যেমন বিপন্ন হইয়া পিতামাতাকে না ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া ডাকে, আমিও সেইরূপ তোমায় ডাকি। আমি ডাকি না আমার স্বভাব ডাকে। তোমায় না ডাকিলে উদ্বেগ বাড়ে, ডাকিলেই ভাল থাকি তাই তোমায় ডাকি।"

২১ আশ্বিন—"শ্রীহরির শ্রী সমস্ত গৃহে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত। অন্নে বস্ত্রে দেহ মনে রক্তে প্রাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।"

২২ আশ্বিন—"শিশুরা নিন্দা অপমান বোঝে না। মা যখন ক্রোধমুখে শিশুকে শাসন করেন তখন সে হাসে। শিশুরা হাসিলে মারও রাগ কমিয়া যায়।"

৪ কার্ত্তিক—"পবিত্রতাই পবিত্রতার কারণ, আর অপবিত্রতাই অপবিত্রতার কারণ। যেমন দুর্ব্বলতা দুর্ব্বলতার কারণ সেইরূপ।"

৫ কার্ত্তিক—"ব্রাহ্মণের সন্তান মৃত্যু স্বীকার করিতে পারে, তবু চণ্ডালের সঙ্গে একত্র এক গৃহে বাস করিতে পারে না।"

৬ কার্ত্তিক—"মানুষকে প্রতারিত করা সহজ ঈশ্বরকে প্রতা-

রিত করা কঠিন কিন্তু মানুষেরা তাহার উল্টা করে। তাহারা ঈশ্বরাপেক্ষা মানুষকে অধিক ভয় করে।"

৭ কার্ত্তিক—"তোমরা যদি বিশুদ্ধ চরিত্র না হও, তোমাদের জন্ম কেবল অপকারের জন্য হইবে। আর যদি বিশুদ্ধ হও, তবে উপকারের জন্য হইবে।

১০ কার্ত্তিক—"স্বর্গের প্রেম পবিত্র, সংসারের স্পর্শে অপবিত্র হয়। স্বর্গে মালিন্য প্রবেশ করিলে স্বর্গের কান্তি আর থাকে না।"

১৪ কার্ত্তিক—"যিনি মনে করেন বুঝিয়াছি, তিনিই বস্তুতঃ বুঝিতে অসমর্থ।"

১৫ কার্ত্তিক—"যিনি গালাগালি দেন তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ জানিয়া স্থির থাকা শ্রোতার চতুরতা।"

২৬ কার্ত্তিক—"মনুষ্য আর পশুতে বিভিন্নতা কি? মনুষ্য ঈশ্বরকে দেখে, তাহার কথা শোনে ও বোঝে, পশুরা ঈশ্বরকে দেখে না, তাঁহার কথাও শোনে না ও বোঝে না।"

২৭ কার্ত্তিক—"জ্ঞানী লোকেরা বলে বিশ্বাস অন্ধতা, বিশ্বাসীরা বলে জ্ঞান অন্ধতা। আমরা বলি, সন্দেহ হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা হইতে জ্ঞান জন্মে এবং বিশ্বাসের সাক্ষ্য লইয়া জ্ঞান মীমাংসা করে। এ স্থলে বিশ্বাসকে অন্ধ বলাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, বিশ্বাসের নিকট জ্ঞানী পরিচিত নহেন।"

২৮ কার্ত্তিক—"যে দাঁড়ায় সে বসে, যে বসে সে শোয়, যে শোয় সে নিদ্রা যায়, যে নিদ্রা যায় সে মরে, কিন্তু যে ক্রমাগত চলে জীবনের লক্ষণ তাহাতেই বিদ্যমান।"

২৯ কার্ত্তিক—"সংসারের লোকেরা আপনা অপেক্ষা নিম্ন-

শ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া গৌরব সঞ্চয় করে এবং অধঃপাতে যায়, আর বড় লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোক-দিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া আপনার হীনতা ও অভাব বুঝিয়া ক্রমশঃ দেবত্ব লাভ করে।"

৩০শে কার্ত্তিক—"শিরশ্ছেদন করিলে মানুষ মরে কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যাহারা শিরশ্ছেদন করিতে যায়, তাহারা মনুষ্যত্বের অতীত।"

১লা অগ্রহায়ণ—"জ্ঞান হইতে অভিমান, অভিমান হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় বা স্ফূর্ত্তি পায়, সুতরাং জ্ঞান থাকিতে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন না। অর্থাৎ যত দিন মানুষ বোঝে, বোঝায়, করে করায়, তত দিন অপর কোন কর্ত্তৃত্বের বল স্বীকার করিতে চাহে না।"

২রা অগ্রহায়ণ—"ভয়ে কিংবা লজ্জাতে অন্তরের ভাব গোপন করিয়া অন্য প্রকার কথা বলাতে মন্দ ফল উপস্থিত হয়, অনেক সময়ে ধর্ম্মপ্রিয় লোকেরা তাহা ভুলিয়া যায়। স্বার্থপর সংসার কি না করিতে পারে ?"

৩রা অগ্রহায়ণ—"অনেকে প্রার্থনা করিতে বসিয়া হৃদয়ের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ভাষায় অনুরোধ রক্ষা করেন। সংসার এই প্রকারে লোকের সুন্দর হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলে।"

৪ঠা অগ্রহায়ণ—"কর্ম্মকার যেমন এক একটি লোহা প্রস্তুত করিয়া এক রাশি লোহা করে, জীবন যদি ভাল করিতে চাও তবে সেইরূপ দৈনিক ব্যাপারের হিসাব রাখ এবং পূর্ব্বকার ব্যাপারের সঙ্গে পরবর্ত্তী ঘটনার মিল কর, কত দূরে আসিলে বুঝিতে পারিবে।"

৫ই অগ্রহায়ণ—"মানুষের পরিত্রাণ অতি সহজ, অন্য দিকে বড়ই দুরারাধ্য। মানুষ কেবল ইচ্ছা করিলেই পরিত্রাণ পাইতে পারে, অন্য দিকে চেষ্টা করিলেও কিছু করিতে পারে না।"

৬ই অগ্রহায়ণ—"নামের গুণ আছে তাহা নাম লইলেই বুঝিতে পারা যায়। নাম না গ্রহণ করিলে তাহার গুণ কিরূপে জানা যাইবে? ঔষধ না খাইলে তার গুণ কিরূপে জানিবে?"

৭ই অগ্রহায়ণ—"রোগ না বুঝিয়া যিনি ঔষধ প্রয়োগ করেন তিনি রোগের প্রতিকার করিতে পারেন না, কিন্তু রোগবৃদ্ধি করিতে পারেন।"

৮ অগ্রহায়ণ—"যত্ন করিলেই রত্ন মিলে ইহা এক প্রকার পুরাতন সত্য। কেন না যিনি যত্ন করিয়াছেন তিনি রত্ন লাভ করিয়াছেন।"

৯ই অগ্রহায়ণ—"সত্যে সত্যে বিবাদ হয় না। সত্য ঈশ্বরের, সত্যে সত্যে বিবাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আপনি বিবাদ করেন।"

১০ই অগ্রহায়ণ—"যদি বহু পাপের আবর্ত্তে পড়িয়া থাক তবে সরল হইতে পারিলে পরিত্রাণের আশা আছে।"

১১ই অগ্রহায়ণ—প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস ভাই প্রসন্নকুমার সেন সহ প্রচারে বাহির হন। উত্তোরপাড়া, যোড়পুকুর, চুঁচড়া, বঁইচি, বর্দ্ধমান, এই সকল স্থলে উভয়ে একত্র প্রচারের কার্য্য করেন। তৎপর ভাই প্রসন্নকুমার সেন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তিনি তথা হইতে প্রচারার্থ রঙ্গপুরে যান। সদ্যঃপুষ্করিণী, রঙ্গপুর, তাজহাট, ফুলবাড়ী এই সকল স্থানে প্রচারানন্তর ১৪ই পৌষ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উৎসবের সময় হইতে

প্রায় পাঁচ মাস কাল কলিকাতায় স্থিতি করিয়া ২০ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতাপরিত্যাগপূর্ব্বক কেদারপুর, মহিষামুড়া, বৈষ্ণবপাড়া, কড়াইল গ্রাম, তেঘরি,হালাসিয়া, পাকুল্যা, গুল্‌ট্যা, প্রভৃতি স্থানে মাসাবধি ভ্রমণপূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্ব (৭ই জ্যৈষ্ঠ) হইতে এ কয়েকটী কথা লিখিত আছে, "স্বভাবে থাকিতে পারিলে অভাবকে ভাবে পরিণত করিতে পারা যায়, যে অতপরঃ সময়ে স্বভাবে থাকিতে পারে, তাহারই ক্ষমতার প্রশংসা ;" (৮ই জ্যৈষ্ঠ) "আমি বলি রাম ভাল, হনু বলে নাম ভাল।" (২৩ই জ্যৈষ্ঠ) "ভদ্রতা রক্ষার জন্য পাপ করা অনুচিত, যে ভদ্রতার জন্য পাপ করা আবশ্যক হয় তাহা কখনও ভদ্রতা নহে।" (১৩ই জৈষ্ঠ) "বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাভূমি ঈশ্বর, বিশ্বাস তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না।" কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১লা ভাদ্র হইতে ৯ই ভাদ্র পর্য্যন্ত বিশ্বাস ও প্রেম বিষয়ে চিন্তাগুলি সংস্কৃত পদ্যে লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর দৈনন্দিনলিপিতে যে সকল চিন্তা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১০ই ভাদ্র—"মানুষবিচারকের বিচারালয়ে অন্য এক জন সাক্ষ্য দান করে, ঈশ্বরের বিচারালয়ে বিচারক ও সাক্ষী একই ব্যক্তি।"

"বিশ্বাসে অনুরাগ ও বিরাগ দুইই জন্মে ; উত্তমে অনুরাগ অধমে বিরাগ।"

১২ই ভাদ্র—"তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তাহা ঘুচাইব কিরূপে ?"

১৩ই ভাদ্র—"শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ আছে,। শরীর মনের স্বাস্থ্যের অপেক্ষা করে,মনও শরীরে স্বাস্থ্যের অপেক্ষা করে।"

১৪ই ভাদ্র—"আমি মার কোলে থাকি, আমার ভয় কি ?"

১৫ই ভাদ্র—"দিন শুভ হওয়া উচিত, অবিশ্বাসীর দিন অশুভ হয়।"

১৬ই ভাদ্র—"শরীর যেমন রোগে অসুস্থ হয়, আত্মা তেমনই পাপে অসুস্থ হয়। শরীরের যেমন পবিত্র স্থান ও পরিষ্কৃত বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, আত্মার তেমনি সৎসঙ্গ ও স্বর্গের চক্ষু বিশেষ ইষ্টপ্রদ।"

"পিতা মাতা যেমন সাধারণ মানব নহেন কিন্তু আমার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ, ঈশ্বরও সেইরূপ কেবল বস্তু মাত্র নহেন, কিন্তু সকল বস্তুর মূলতত্ত্ব।

"সম্পদের সময় যদি সেই প্রাণের প্রাণকে লইয়া সম্পদ ভোগ করিতে না পারি তবে বিপদ্ দেখিয়া ভয়ে তাঁহাকে বিশ্বাস করা বিশ্বাস নহে।"

"বৃদ্ধ বয়সে পিতা আছেন বা ছিলেন কি না এ প্রশ্ন যেমন ভয়ানক, ঈশ্বর আছেন কি না এ প্রশ্নও সেইরূপ।"

"বিশ্বাসকে দূর করিয়া দিয়া ভালবাসা আর মৃতদেহকে অলঙ্কার দিয়া সাজান একই কথা।"

১৭ই ভাদ্র—"ধর্ম্ম যদি সহজ হইত তবে তাহার জন্য লোকে কষ্ট পাইয়া মরিত না, আবার ধর্ম্ম যদি দুঃসাধ্য হইত তবে ভগবান কাহার নিকট ধর্ম্মের দাওয়া করিতেন না, এই বলিয়া ধর্ম্ম সহজও নয়, দুঃসাধ্যও নয়।"

১৮ই ভাদ্র—"ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল সুখই কিছু ক্ষণ পরেই ভয়ানক দুঃখ ও বিরক্তিজনক হয়। সুখই যদি দুঃখের কারণ হয় তবে তাহাকে সুখ বলিব কিরূপে ?"

১৯ ভাদ্র—"মানুষের যাহা কার্য্য তাহা দেবতারা স্পর্শ করেন না কিন্তু দেবকার্য্যে মানুষের অধিকার আছে।"

২০ ভাদ্র—"নিশ্বাস ইব বিশ্বাসঃ স্বতঃসিদ্ধোঽপ্রমেয়ক। প্রমাতা চ প্রমাণানাং নির্ব্বিকল্পো নিরত্যয়ঃ।"

২১ ভাদ্র—"আমি কেন তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছি তাহা জানি না। তুমি জান্‌ছ ঠাকুর, আমার মনের কথা।"

২২ ভাদ্র—"আমি তোমার মুখ দেখিলেই সুখী হই, তাই বারে বারে দেখিতে আসি।"

২৩ ভাদ্র—"যে তোমায় দেখেছে, সে আর আত্মবশে থাকিবে কিরূপে? দেবতারা পারেন না, মানুষ কোন্ ছার?"

২৪ ভাদ্র—"ইন্দ্রিয় দমন করিতে সকলেই বলে, কিন্তু কেউ করে না। পরকে বলা যেমন নিজে করা তেমনি নহে।"

২৫ ভাদ্র—"যদি বিশ্বাস থাকে, সে কখন স্খলিতপদ হয় না, সুতরাং দুষ্ট কার্য্যও করিতে পারে না।"

২৬ ভাদ্র—"হরি প্রাণ—যে উপাসনা করিতে বসিয়া হরি দর্শন পায়, সে এদিক্ ওদিক্ তাকায় না। যে তাকায় সে হরি দর্শন পায় না।"

২৭ ভাদ্র—"হরি সুন্দর—সুন্দর বস্তু হইলেই মনকে আকর্ষণ করিবে নিশ্চয়, আমি সেই সুন্দর বস্তু দেখিয়া আকৃষ্ট হইলাম না এ কথা মিথ্যা।"

১ আশ্বিন—"সুখের সময়ে হরিপাদপদ্ম মিষ্ট বলিতে পারা সহজ, কিন্তু দুঃখ কষ্টে রোগ শোকের ভিতরে সেই পদে পড়িয়া থাকাই মিষ্টভাবোধের প্রমাণ।"

৯ আশ্বিন—"আমি যে কি জন্য কোথায় আসিয়াছি তাহা কিছুমাত্র স্মরণ নাই।"

১০ আশ্বিন—"তুমি লোককে সুখী কর শুনিয়াছি সেই লোভেই এখানে আসা, এখন যদি মলিন মুখে ফিরে যেতে হয়, তবে তো বড় কষ্ট।

১১ আশ্বিন উপাসনান্তে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া রজনীতে ফুলবাড়ীতে গমন করেন। সেখানে প্রতিদিন প্রাতে দ্বারে দ্বারে নাম কীর্ত্তন, একত্র উপাসনা, সায়ংকালে পারিবারিক উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, কীর্ত্তন, ও প্রার্থনা হয়। ১৫ আশ্বিনের দৈনন্দিনলিপিতে লিখিত আছে, প্রাতঃকালে টহল, মধ্যাহ্নে মিলিত উপাসনা, সমস্ত দিন সৎপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তন, রাত্রিতে অতি মিষ্ট পারিবারিক উপাসনা। ১৭ আশ্বিন স্থানীয় উৎসব এবং বিধানতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ হয়। ১লা আশ্বিন প্রাতে ৬৷৷টার সময়ে উপাসনা আরম্ভ, ১১টা পর্য্যন্ত উপাসনা ও উপদেশ। মধ্যাহ্নে সমালোচনা ও অপরাহ্নে কীর্ত্তন ও রাত্রিতে পারিবারিক উপাসনা। পর দিন ফুলবাড়ীপরিত্যাগপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে সদ্যঃপুষ্করণীতে আহারাদি করিয়া প্রত্যূষে রঙ্গপুরে উপস্থিত হন। রঙ্গপুরে তিন দিনমাত্র অবস্থান করিয়া ২৪ আশ্বিন কাকিনীয়ায় যাত্রা করেন। রঙ্গপুর হইতে কাকিনীয়া প্রায় ২০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। যিনি কোন কালে পাল্কী ভিন্ন ক্রোশাধিক পথও গমন করেন নাই, আজ তিনি প্রচারকজীবনের সাহসিকতাবলম্বন করিয়া পদব্রজে দূরবর্ত্তী কাকিনীয়ায় চলিলেন। ২৫ আশ্বিন তত্রত্য জমিদার শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জনের সহিত আলাপ, সাধারণ লোক-দিগের সঙ্গে আলাপ, তর্ক বিতর্ক, পর দিন "শাস্ত্র অভ্রান্ত" এই

বিষয়ে বক্তৃতা হয়। পথপরিশ্রমের পর বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাম্বয়ে কার্য্যের উদ্যম পরিশেষে ২ কার্ত্তিক স্পষ্ট জ্বর উপস্থিত করিল। জ্বরের দৌর্ব্বল্য অপনীত হইতে না হইতেই ১১ কার্ত্তিক সোমবার অত্যুদ্যমসহকারে নগরসঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংকীর্ত্তনকালে মেরুদণ্ডের স্নায়ুতে আঘাত লাগিল, ব্যথা উপস্থিত, অথচ উদ্যমের বিরাম হইল না। ১৬ কার্ত্তিক তিনি কাকিনীয়াপরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু প্রচারের প্রবৃত্তি এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, সুতরাং তথা হইতে কুড়ীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ২০ কার্ত্তিক "ধর্ম্মের মূল তত্ব কি?" তদ্বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দেন, এবং পরদিন ধুবড়ী যাত্রা করেন। সেখানে ২৩ কার্ত্তিক বালিকা-বিদ্যালয়-গৃহে "শাস্ত্র কি?" এবং পরদিন বিজনীহলে "উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কি" তদ্বিষয়ে বক্তৃতা হয়। এখান হইতে কুড়ীগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তত্রত্য ডাক্তরের পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। ২৯ কার্ত্তিক রঙ্গপুরে আসেন, সেখানে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, অথচ ১ অগ্রহায়ণ অপরাহ্ণ ৫৷৷টার সময় অতি উৎসাহসহকারে "শাস্ত্র অভ্রান্ত এবং এক" এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া রাত্রি ৮টার সময় মন্দিরে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ৩ অগ্রহায়ণ সদ্যঃপুষ্করণীতে গমন করেন। ৪ অগ্রহায়ণের দৈনন্দিনলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন, "মধ্যাহ্নে কলিকাতা যাইব না দিনাজপুর যাইব সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া একেবারে কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা হইল, তাহাই করিলাম। কলিকাতায় গিয়া দেখি পর দিন আচার্য্যের জন্মদিনের উৎসব, উপাসনার পালা আমার। আশ্চর্য্য ভোগ!!" ৫ অগ্রহায়ণ আচার্য্যের জন্মদিনে প্রেরিত কালীশঙ্কর উপাসনার কার্য্য করেন। এই

দিনের দৈনন্দিনলিপিতে দুই দিনে এই দুইটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে :—

আলেয়া।

দেও দরশন, নাথ! তব দরশনে যেন পাই নূতন জীবন।

নয়নে নয়ন রাখি, যোগানন্দে ডুবে থাকি, শান্তি-নীর অঙ্গে মাখি জুড়াই জীবন।

গৃহ বিত্ত পরিবারে, সদা হেরিব তোমারে, তব সঙ্গে যোগভঙ্গ হবে না কখন; নিরখিয়া তব মুখ, ভুলে যাব অন্য সুখ, সদা নিত্যানন্দরসে থাকিব মগন।

ললিত।—একতালা।

চির দিন তোমারি থাকিব, দেবের দুর্লভ চরণপল্লব হৃদয়ে ধরে রাখিব।

প্রাচীন নবীন, লঘু কি প্রবীণ, কালের অধীন সবে মানিব।

কালের অতীত, তুমি হে অমিত, তোমারে কেমনে ছাড়িব; তব যোগে রত, থাকি অবিরত, তোমার প্রসাদ পাইব; তোমারি কীর্ত্তনে, দেহ প্রাণ মনে, এক সনে সবে থাকিব।

বিবেক ইন্দ্রিয়, সব তব প্রিয়, তোমারি মহিমা গাইছে, তাহাদের সনে একতান মনে, তব গুণ সদা গাইব।

প্রেরিত কালীশঙ্কর কলিকাতায় আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। উদরাময় প্রভৃতি নানা প্রকার অসুখে তিনি রঙ্গপুরে আসিয়াই আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এখনও

সে সকলের বিরতি হয় নাই। ৮ পৌষ উৎসবের প্রণালী স্থির হইবার কথা, সেই দিন, এবং ১১ মাঘ ও ১৭ মাঘের দরবারের অধিবেশনে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ তিনি উপস্থিত হন, তৎপরে আর অধিবেশন উপবেশনকরিবার তাঁহার সামর্থ্য থাকে না। দৈনন্দিনলিপিতে এই কয়েক দিন আত্মচিন্তা এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে :—

২৩ অগ্রহায়ণ—"লোভ মোহ আসক্তি তুই প্রকার, এক ঈশ্বর ও ঈশ্বরভক্তদিগের প্রতি, দ্বিতীয় সংসারের প্রতি। এক প্রকার মোহ আসক্তি লোভ অন্ধকারের প্রতিকূলে, আর এক প্রকার আলোকের প্রতিকূলে।"

২৪ অগ্রহায়ণ—"মানুষ সকলের দাস হইতে সঙ্কল্প করে, কিন্তু মন তাহার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত নহে। মনকে অনেক বুঝাইলেও সে বোঝে না।"

২৬ অগ্রহায়ণ—"পাপেতে অগ্নি আছে, পুণ্যেতে অগ্নি আছে। পাপের অগ্নি মানুষকে দগ্ধ করে, পুণ্যের অগ্নি পাপকে দগ্ধ করিয়া মানুষকে সুন্দর করে।"

৮ পৌষ—"তাঁহার অর্চ্চনাতে মন মগ্ন থাকিলে অন্য দিকে ধাবিত হয় না। ঈশ্বরোপাসনা করিতে বসিয়া অস্বাভাবিক পাণ্ডিত্যপ্রকাশকরার ন্যায় ঈশ্বরে অবিশ্বাস আর নাই, কেন না যে ঈশ্বরের কাছে উপবিষ্ট, সে কি আর বিস্মিত চমকিত না হইয়া থাকিতে পারে?"

৯ পৌষ—"অদ্য কি করিব জানি না।" "যে বলে ঈশ্বর আছেন সে কি তাঁহাকে দেখিয়া বলে? যে চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করা যায়, সে চক্ষু প্রায় অধিকাংশ লোকের নাই।"

১০ পৌষ—"ঈশ্বর কর্ত্তা, অতএব কল্য কি হইবে আমার চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। যদি ক্ষমতা থাকিত, আমার রুচিবিরুদ্ধ কার্য্য আমি হইতে দিতাম না, ভাগ্যবশতঃ সে ক্ষমতা নাই।"

১১ পৌষ—"তুমি কে?" "মনুষ্যকে ভাল করে কে? যে তাহাকে অপবিত্রতার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেয়, যে অপবিত্রতা হইতে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়।"

১২ পৌষ—"জ্ঞান আর কার্য্য, কাহার মূল্য অধিক। জ্ঞান ব্যতীত প্রণালী স্থির হয় না, প্রণালী ব্যতীত কার্য্য আরম্ভ হয় না, কিন্তু কার্য্য করা অভ্যাস না থাকিলে কেবলমাত্র জ্ঞান অচল। একটি দেহে চক্ষুরিন্দ্রিয় জ্ঞান, গমনেন্দ্রিয় পদ অভ্যাস।

এবার মাঘোৎসবে ভাই প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে যাহাতে মিলন হয় এজন্য যত্ন উপস্থিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারি সেন প্রভৃতি এই উদ্দেশে শান্তিসভা পুনর্গঠন করেন এবং সেই শান্তিসভা হইতে মিলিত উৎসব হইবার প্রস্তাব ৮ই পৌষ (১৮০৭ শক) শ্রীদরবারে উপস্থিত হয়। দরবারের ইহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকাতে মিলনের কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকে। পরিশেষে শান্তিসভা মফঃস্বল হইতে সমাগত বন্ধুগণ ও নারীগণের সহিত মিলিত হইয়া "নববিধানমণ্ডলীর নামে" ১১ মাঘ শনিবারে নিম্ন লিখিত প্রস্তাবটি শ্রীদরবারে প্রেরণ করেন এবং উহা দরবার কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যদেবের আসনের সম্মুখস্থ শূন্যস্থানে স্বতন্ত্র আসন আচার্য্যদেবের আসন হইতে নীচু করিয়া উপাচার্য্যের জন্য স্থাপিত হয়, এবং সেই আসনে বসিয়া আগামী কল্য মিলিত উৎসব হয়।"

এই নির্দ্ধারণানুসারে উৎসবের কার্য্যসমাধাহইবামাত্র প্রায় চারিশত উপাসক এই নির্দ্ধারণটি তাঁহাদের সকলের বিবেকানুমোদিত বলিয়া চিরস্থায়ী করিবার জন্য এক আবেদন উপস্থিত করেন। ৮০ জন ব্রাহ্মিকার স্বাক্ষরিত এই মর্ম্মের আর এক আবেদনও প্রেরিত হয়। এই আবেদনের মীমাংসার জন্য ১৭ মাঘ শুক্রবারের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে আবেদন গৃহীত হয় না, কেন না প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস ঐ নির্দ্ধারণটি স্থায়ী হয়, ইহা অনুমোদন করেন না। যে দিন প্রথমে ঐ নির্দ্ধারণটি দরবারে গৃহীত হয় সে দিন ভাই প্রসন্নকুমার সেন সভায় অনুপস্থিত হন, আচার্য্যের সমাধির সম্মুখে সমগ্র রজনী অতিবাহিত করেন। প্রেরিত কালীশঙ্করের তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে একহৃদয়তা বশতঃ তিনি আর দ্বিতীয় দিনে প্রস্তাব স্থায়ী হইবার পক্ষে সম্মতি দান করেন না। দরবার এক বার যে বিষয়ের অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা কখন ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইতে পারে না, এই হেতুতে উপাধ্যায় উপাসকগণের আবেদনানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হন। প্রেরিত কালীশঙ্কর যখন যে বিষয়টি উচিত মনে করিতেন তৎসম্বন্ধে তাঁহাতে অতিতীব্রভাব প্রকাশ পাইত। ১৬ মাঘ ও ১৮ মাঘের (১৮০৭ শক) দৈনন্দিন লিপিতে যে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যে এই-ভাবগ্রহণোদিত, ইহা মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন।

১৬ মাঘ—"পৃথিবীর জন্য লৌকিকতার জন্য ধার্ম্মিক লোকেরা ধর্ম্মবিধিভঙ্গ করেন, সরল কথার নানা প্রকার বিভিন্ন অর্থ করিয়া নিজের কুরুচি অনুসারে ধর্ম্মমত গঠন করিয়া লইতে পারেন।"

১৮ মাঘ—"যে বিধি ভঙ্গ করে সে বিধাতার হস্ত দেখে না। বিধাতার হস্ত দর্শন করিলে আর তাঁহার বিধি ভঙ্গ করিতে সাহস পায় না।"

২০ মাঘ রাত্রি বারটা দশ মিনিটের পর প্রেরিত কালীশঙ্করের দ্বিতীয়া কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যাকে তিনি অঞ্জনা নামে ডাকিতেন। ১৭ ফাল্গুন ইহার জাতকর্ম্ম হয়। "অঞ্জনার জাতকর্ম্ম" এই কয়েকটী কথা মাত্র সে দিনের দৈনন্দিন লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। এই দিন হইতে তাঁহার দৈনন্দিন চিন্তা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

২০ মাঘ—"কেহ যদি ভাল হইবার সঙ্কল্প করে, তবু সে পারে, না কেন? সে ভাল হইবে বলিয়া প্রকৃত সঙ্কল্প করিলে নিশ্চয় ভাল হইতে পারে। বস্তুতঃ সে ভাল হইবে ইহা কেবল লোকের নিকট বলে, তাঁহার মনে তেমন সরল ইচ্ছা থাকে না তাই হয় না।"

২১ মাঘ—"মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, তুমি বেঁচে আছ কিরূপে? তাহা হইলে সে বলে 'আমি আহার করি সেই আহার্য্য হইতে রক্ত সবল হয় তাহা হইতে আমি বাঁচি' কিন্তু 'আহার্য্য রক্ত জন্মায় কিরূপে, রক্ত পরিষ্কৃত ও পরিচালিত করে কে?' যদি এই সকল জিজ্ঞাসা কর, বলিবে 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি কি তাহার গুণগ্রাম বলিবে, কিন্তু ইহা বলিবে না যে ঈশ্বরকৃপায় জীবিত আছি।"

২২ মাঘ—"লোকে সাধু হইতে পারে, তপস্যা করিতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা ব্যতীত কদাচ তাহা ঈশ্বরের নিকট পরিগৃহীত হইতে পারে না।"

২৩ মাঘ—"মনুষ্য হইয়া যে ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারে, ঈশ্বরকে দুর্ব্বল দৃষ্টিহীন অচলবৎ উপায়হীন মনে করিতে পারে, তাহার মত ভয়ঙ্কর জীব আর নাই।"

২৪ মাঘ—"সুখে দুঃখ হয়, দুঃখেও সুখ হয়, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিলে কেহ সুখ চাহে না দুঃখও চাহে না। কেহ সুখের জন্য আশা করে কেহ দুঃখের জন্য আশা করে। তাই এক জন বলিয়াছিলেন, অন্ধকার রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিবার উপায় নাই।"

২৫ মাঘ—"শয়নের শয্যা নাই, পরিধানের বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই, বৃক্ষতল ব্যতীত আশ্রয় স্থান নাই, শুনিয়াছি, হে দীন-বন্ধু, তুমি যাহাকে ভাল বাস তাহাকে এই সকল সুখ অর্পণ কর। বল দেখি, ঠাকুর, আমি কি তপস্যা করিয়া এত সুখ পাইলাম।"

২৬ মাঘ—"যার বল অধিক সেই বলবান্, যে বলবান্ সে শত্রুকে ভয় করে না। কাহার বল শরীরে, কাহার বল মনে। যে শরীরের বলে বলবান সে শরীরধারী শত্রুর ভয়ে নিরাপদ, যে মানসিক বলে বলবান্ সে মনঃসঞ্চারী শত্রুর ভয়ে নিরাপদ।"

২৭ মাঘ—"হে হরি, তুমি মহাসূর্য্য, আমি গ্রহ হইয়া তোমা-কর্ত্তৃক বিধৃত, তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট, তোমাকর্ত্তৃক আলোকিত, হইয়া তোমাকে প্রদক্ষিণ করিব; অথবা উপগ্রহ হইয়া তোমার গ্রহগণকর্ত্তৃক আলোকিত, রক্ষিত ও আকৃষ্ট হইয়া স্থিতি করিব কবে? 'বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।"

২৮ মাঘ—"যে চায় সে পায়, না চাহিলেও পায়।"

২৯ মাঘ—"মার সন্তান মার মত। সাধারণ ও বিশেষ ভাব।"

৩০ মাঘ—"সাধু সাধু চায়। অসাধু অসাধু চায়।"

১ ফাল্গুন—"ধন চোরকে অস্বীকার করে না।"

২ ফাল্গুন—"চিন্তা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রেমের শাসন কি? প্রেম বুঝি, হরি, প্রেমের শাসন বুঝি না। প্রেমেতো শাসন হয়। প্রেমে লোক বৈয়ে যায়, কাজ কর্ম্ম উঠে যায়, লোকে গ্রাহ্য করে না, এই তো জানি ঠাকুর, শাসন কিরূপ তাতো জানি না।"

৩ ফাল্গুন—"পৃথিবীর সাধারণ লোকেরা যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিবার রীতি অবগত আছে, স্বর্গ সে রীতির বিরোধী।"

"অনেকে বৃদ্ধের ন্যায় অল্পবিশ্বাসী, অনির্ভরপ্রিয়, বিষয়াসক্ত, সন্দিগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে শিশু মনে করেন, ইহা এক প্রকার অন্ধতা বা মত্ততা।"

৪ ফাল্গুন—"যেমন কালীঘরে প্রবেশ করিয়া সাবধান হইলেও গাত্রে কালীর দাগ লাগিবে, সেইরূপ পরের দোষ প্রদর্শন করা এমন লজ্জাজনক যে তাহাতে আপনাকে দোষমুক্ত রাখা যায় না।"

৫ ফাল্গুন—"বিশ্বাস করার অর্থ অন্ধতা নহে,কিন্তু দর্শন করা। যে দর্শন করে তাহাকে অন্ধ বলিব কিরূপে?"

"অনেকে অন্যের নিকটে যাহা পাইবার দাওয়া করেন, নিজে তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহা কি প্রহেলিকা নয়?"

৬ ফাল্গুন—"বৃদ্ধ হইলে বুঝা যায়, সরস উপাসনার মূল্য কত এবং ভাল ভাল সাজান কথা কেমন অসার। যখন বাক্য উচ্চা· রণ করিতে পারিবে না, চিন্তা করিয়া ভাল ভাব বুঝাইতে পারিবে না, তখন বুঝিতে পারিবে, ঈদৃশ উপাসনা করিয়া প্রতারিত হইতেছ।"

৭ ফাল্গুন—"যে আপনি আপনাকে পণ্ডিত মনে করে, অন্য লোকে তাহাকে মূর্খ জানে। যে আপনি আপনাকে মূর্খ জানে, অন্য লোকে তাহাকে পণ্ডিত বলে। সক্রেটিস এই দলের পণ্ডিত ছিলেন।"

৮ ফাল্গুন—"কাহার কাহার ধন, মান, মর্য্যাদা, বিদ্যাবুদ্ধির প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অহঙ্কার অভিমান থাকে। ইহাকেই বলে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।

৯ ফাল্গুন—"যাহা আপনার জীবনে থাকিলেও বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু অন্যের জীবনে অনুমান উপমান করিতেও সহজ বোধ হয়, তাহার নাম পাপ।"

১১ ফাল্গুন—"অজরমজমপৌরং পুণ্যলাবণ্যগৌরং
নয়নহরমবর্ণং বর্ণহীনং সুবর্ণম্।
হৃতহৃদয়বিবাদং নষ্টসর্ব্বাবসাদং
নিরবসরবিকাশং নৌমি তং স্বপ্রকাশম্॥

১২ ফাল্গুন—ধৃতনবনবরূপং সত্যজং স্বস্বরূপং
হতকলুষপলাশং ধ্বস্তপাপাবকাশম্।
নিজজনজিতবাসং ত্রাসহৃদ্ভূত্যদাসং
সরলজনশরণ্যং নৌমি তথৈকধন্যম্॥

১৩ ফাল্গুন—গুণিগুণগণগণ্যং শুদ্ধসৎপ্রেমপণ্যং
পরজনকমজন্যং ত্রাণযানে সরণ্যম্।
প্রসভমনভিগম্যং প্রেমভাজাং প্রণম্যং
স্বজনহৃদয়রম্যং নৌমি তং ভক্তদম্যম্॥

১৪ ফাল্গুন—অচরচরবিহারং সর্ব্বসত্ত্বাবতারং
মহিতপদমুদারং সর্ব্বতোঽভদ্রবারম্।

বিধৃতসকলভারং দুষ্টচেষ্টাপসারং
তমভিলষিতসারং নৌমি পুণ্যোপচারম্॥

১৫ ফাল্গুন—অবিমিতমহিমানং ক্লেশকল্লাবসানং
সকলগুণনিধানং প্রাণিনাং প্রাণযানম্।"

১০ চৈত্র—"মানুষের মনুষ্যত্ব কখন দুষ্ট নহে, দুষ্টভাব যে সকল তাহা মনুষ্যত্বের অতীত। কেহই আপনার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারে না, এই জন্য পাপ মন্দকার্য্য করিতে পারে, জানিলে আর পারিত না।

১১ চৈত্র—"লোকেরা সত্যানুরাগের অভিমান করে, কিন্তু যেটি প্রতিপালন করা তাহার নিজের ইচ্ছা নহে সেটি সত্য হইলেও অগ্রাহ্য করে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে সত্যের জন্য আমার জীবন, এ কার্য্য আমি কখন করিতে পারি না।"

১২ চৈত্র—"মনুষ্যের উচ্চতা কেবল সত্যের জন্য, মনুষ্যের নীচতা অসত্যের জন্য। যেমন গুণিতের সঙ্গে গুণকের সম্বন্ধ সেইরূপ মনুষ্যের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ।

রোগশয্যা।

প্রেরিত কালিশঙ্কর যে রোগে প্রায় চারি বৎসর শয্যাগত ছিলেন, সেই রোগের প্রারম্ভেই তিনি শয্যাগত হইলেন। ১৮০৮ শকের ১৬ জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার রোগসম্বন্ধে এই একটি সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়:—"ভাই কালীশঙ্কর দাস প্রায় ৮মাস হইতে দারুণ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। গত বৎসর যখন তিনি কাকীনা, রঙ্গপুর, কুড়িগ্রাম ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রচার

জন্য গমন করেন, তখন দুর্ব্বল শরীরে সবলে সঙ্গীত করায় তাঁহার পৃষ্ঠে একটী বেদনা ধরে, সেই বেদনা অনেক সেবা শুশ্রূষাতে আরোগ্য না হইয়া ক্রমে উহা প্রবল হয় এবং তাহাই এখন প্রায় সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিষম যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। তিনি দিবা রাত্রির মধ্যে ভাল ভাবে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন না, বুকে পিঠে সর্ব্বদাই বেদনায় অস্থির, তাহার উপর আবার বামপদখানি একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, উঠিতে বসিতে ভয়ানক কষ্ট। প্রথমতঃ বেদনা সামান্য মনে করিয়া প্রলেপ মালিষ প্রভৃতি দেওয়া হয়, তাহার পর বিজ্ঞ ডাক্তর কাস্তগিরি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া প্রায় দুই মাসকাল চিকিৎসা করেন। পরে কবিরাজী চিকিৎসা হয়, তাহাতেও উপকার বোধ না হওয়াতে এলোপেথি চিকিৎসক বিখ্যাতনামা ডাক্তর দয়ালচন্দ্র সোম দয়া করিয়া প্রায় দুই মাস কাল দেখেন। তাঁহার চিকিৎসায় যন্ত্রণার তীব্রতা একটু কম বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রাধাকান্ত ঘোষ মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন।” ২৫ বৈশাখ (১৮০৮) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষ চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া ১৬ জ্যৈষ্ঠ প্রেরিত কালীশঙ্কর আপনি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। যখন তিনি একেবারে অচল হইলেন তখন ৬ আষাঢ় কবিরাজ প্যারী মোহন সেন, ৮ আষাঢ় দ্বারকানাথ সেন তাঁহার চিকিৎসার ভার লন। এ রোগ দুশ্চিকিৎসা তাহা তিনি আপনি জানিতেন; কেন না এক দিন জল পান করিতে গিয়া হিক্কা উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁহার চিকিৎসক রাধা-

কান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ হিক্কা কি আপনি কি বলিতে পারেন? চিকিৎসক বলিলেন, আপনিই বলুন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার যখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন এই হিক্কাতেই মৃত্যু হইবে।" তাঁহার শয্যাক্ষত (bed-sore) সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "যখন দেখিবেন, এই ক্ষত বাড়িয়া চলিল, তখন জানিবেন যে আমার মৃত্যু অদূরে।" সে যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহার ১১, ১৫, ২১, ২৭, ৩০, আষাঢ় ও ১লা শ্রাবণের দৈনন্দিন লিপিতে যে কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতেই আমরা তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি :—

মল্লার।—আড়াঠেকা।

হের গো করুণাময়ী হইনু অচল।
চলে না চরণ জঙ্ঘা রোগেতে বিকল।
পঙ্গু খঞ্জ পরাধীন, রোগেতে মলিন ক্ষীণ,
প'ড়ে আছি শক্তিহীন, অশক্ত দুর্ব্বল।
ভয়ে ফেলে অবিশ্বাস, করিতে চাহে গো গ্রাস,
এই ভেবে বড় ত্রাস, জীবন হ'ল চঞ্চল।

ঝিঁঝিট।—যৎ।

মা থাকিতে কেন রে মন বিমাতার ডরে মর।
বিমাতা বাঘিনী কিন্তু মায়ের ভয়ে জড়সর।
সত্যের কাছে যেমন ছায়া, মায়ের কাছে তেমনি মায়া,
শক্তি নাই কো শুধু কায়া, দেখতে কেবল ভয়ঙ্কর।

মায়ের নামে মায়া কাটে, সে মায়া কি মাকে আঁটে, (মন)
জপিলে সেই নাম মহামন্ত্র থাকে না আর পরাজয়, (মন);
দুর্ব্বল শিশু হৃদয়, তাইতে তোমার ভয় হয়,
(মন) কিন্তু মা পেলে শিশু নির্ভয়,
(ঐ) মায়ের কোলে খেলা কর।

মূলতান।—একতালা।

ও মন, জীবনমরণে জননী চরণে, শরণ লইয়া রও না।
সংসারে এমন নিরাপদ স্থান কোথা আছে আর কও না।
মহাদুঃখে শোকে, ইহপরলোকে, সহায় জননী-করুণা;
(মা তোর) কাছে কাছে থাকে, চোঁকে চোকে রাখে,
তবু যে ফিরিয়া চাও না।
মহাদুঃখে পড়ে কত শতবার, ত্রাহি ত্রাহি বলে করেছ চিৎকার,
আকুল ক্রন্দনে সকলের কাণে আঘাত করেছ অনিবার
গিরিগুহাসম প্রাণশূন্য কাণে নাহি পায় কেহ বেদনা,
কিন্তু মা তখন আসি,মৃদু মৃদু হাসি দিয়াছে তোমারে সান্ত্বনা।

রাগিণী ভৈরবী।—আড়াঠেকা।

অনাথ দুর্ব্বল বলে সদা ঝরে তব আঁখি।
তাই গো মা থাক্‌তে নার কোথাও ছেড়ে একাকী।
রুগ্ন পুত্র কোলে লয়ে, জাগিয়ে থাক অভয়ে,
অভয় দেও মা মহাভয়ে, স্নেহবক্ষে ঢেকে রাখি।

প্রবেশি ধনীর মনে, কাঁদ কত সংগোপনে,
অনাথ সন্তানের জন্যে কর ভিক্ষা গুপ্ত থা'ক।
প'ড়ে তব অশ্রুজল, পাষাণ হয় কোমল,
দেখাও তুমি তারি মাঝে ব্যথিতের ছবি আঁকি।
দেখ্‌লে তোমায় অশ্রুমুখী, পরের দুঃখে সদা দুঃখী,
প্রাণে বড় হইগো সুখী, জননি, তাই তোমায় ডাকি;
ঐ সুন্দর মূরতি, দেখাও সদা ভগবতি,
হর অন্ধতা দুর্গতি, প্রেমাঞ্জন চক্ষে মাখি।

মূলতান।—একতালা।

(ওমন) কাঁদ যদি তবে 'আহা' 'উহু' ছাড়ি মা মা বলে কাঁদনা।

মা-নামের গুণে মুহূর্ত্তে তোমার হরিবে সকল বেদনা।

(ও ভাই) রোগে শোকে দুঃখে হইবে কাতর, মা মা বলে সবে কাঁদে নিরন্তর, তাদের মা নাইকো কাছে, শুধু মায়ের নাম শান্তি দেয় হরে যাতনা; তোমার জননী দিবসরজনী কাছে আছে চেয়ে দেখ না।

(ওরে) জঠরে জনমি জননীর গুণ ভুলে গেলে কেন বল না।

দুঃখের আঘাত সহিতে না পারি,কখন নিরাশ হ'ও না, জননী করুণা প্রেমের বিরুদ্ধে, অবিশ্বাসের কথা ক'ওনা; দুষ্ট ছেলে হ'লে শাসনের ছলে করে বটে কিছু তাড়না,

শাসন হইলে তুলে লয় কোলে, করে মা আবার সান্ত্বনা।

ঝিঝিট।—যৎ।

মা আমি তোমারি কাছে থাকি বড় সুখে গো।
(কোরে) মিষ্ট কথা, ঘুচাও ব্যথা, সদা হাসি মুখে গো।
বন্ধুজনের বঞ্চনা, রোগ শোকের যাতনা,
কিছুই মনে থাকে না, তোমার সম্মুখে গো।
দুঃখময় এ সংসারে, মা নাই যাহার ঘরে,
সে কেবল কেঁদে মরে, রোগে শোকে দুঃখে গো।

---

২ শ্রাবণ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রেরিত কালীশঙ্করকে দেখিতে আসেন, তাঁহার চিকিৎসায় প্রথমে প্রথমে কোন কোন উপসর্গের—কথঞ্চিৎ উপশম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী কোন ফলোদয় হয় না। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত রোগশয্যার বিবরণ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কয়েক দিনের চিন্তা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—

৪ আশ্বিন—"ভোগে রোগ এ কথাটী যেমন সত্য, আবার ভোগে সুখ এ কথাটীও তেমনি সত্য। ভোগের বস্তুভেদে ফল-ভেদ হয়, বিষয়ভোগে রোগ, অমৃতভোগে সুখ।"

৫ আশ্বিন—"মানুষ স্বর্গে গেলেও নিরাপদ হয় না, স্বর্গভোগ করিতে পারিলে নিরাপদ। কেন না স্বর্গেই মানুষের জন্ম স্বর্গেই স্থিতি। কিন্তু কেবল ভোগ করিতে পায় না বলিয়া দুঃখ।"

৬ আশ্বিন—"পশুর কাছেও শিখিবার আছে। পশু কেবল সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ করে মানুষ জ্ঞানী হইয়াও সেরূপ পারে না, ইহা আশ্চর্য্য!!"

৭ আশ্বিন—"ফল যত দিন কাঁচা থাকে কঠিন কৃষ্ণবর্ণ বিস্বাদ

থাকে, কিন্তু পাকিলে কোমল গৌরবর্ণ সুস্বাদ হয়। অতএব কাঁচা থাকা উচিত নহে।"

৮ আশ্বিন—"অনেক ফল আছে পাকিলেও তাহার অম্লত্ব যায় না, সেইরূপ অনেক মানুষ পাকিলে আরও অধিক বিস্বাদ হয়।"

৯ আশ্বিন—"সুখের যে পথ সে পথে কেহ যাইতে চাহে না, কিন্তু দুঃখের পথে গিয়া সুখী হইতে যায়,তাই তাহাদের দুঃখ ঘোচে না, সুখও হয় না।"

৯ কার্ত্তিক—"যেমন শারীরিক সৌন্দর্য্য থাকিলে অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ আত্মার সৌন্দর্য্য থাকিলে শারীরিক সৌন্দর্য্য নিষ্প্রয়োজন।"

১০ কার্ত্তিক—"মানুষের দোষ দেখাইলে সেই দোষ প্রদর্শনকারীর উপরে ক্রোধ করে কিন্তু দোষের উপরে সমাদর করে।"

১১ কার্ত্তিক—"নিজের ত্রুটি ও অপরাধ গণনা করিয়া সর্ব্বদা যে অবনত মস্তকে থাকে সেই উন্নত হয়।"

১২ কার্ত্তিক—"পারুষ্য পুরুষের স্বভাব, কোমলতা নারীর স্বভাব, কিন্তু নারীর পারুষ্য বড়ই অশোভনীয়।"

১৩ কার্ত্তিক—"প্রতিবাসীর সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ করতঃ আপনার সন্তানের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা পশুর স্বভাব।"

১৪ কার্ত্তিক—"পশুতে কেবল পশুত্ব দেবতাতে কেবল দেবত্ব, কিন্তু মানুষেতে পশুত্ব ও দেবত্ব একত্র আছে এই জন্য মানুষের জীবন সঙ্কটময়।"

প্রেরিত কালীশঙ্কর রোগশয্যায় পড়িয়া অলসভাবে কখন দিন কর্ত্তন করেন নাই। প্রতি দিন উপযুক্ত পরিশ্রম না করিয়া ঈশ্বরের গৃহ হইতে অন্নগ্রহণ অপরাধ, এ বিধি তিনি রোগের

যাতনার ভিতরেও বিস্মৃত হন নাই। এ সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে "ধর্ম্ম বিজ্ঞানবীজের" তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড লিখিবার, উপযোগী শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকলে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগের অবস্থায় তিনি সেই সকলের সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখের পূর্ব্বে তাঁহার শরীরাদির অবস্থাজ্ঞাপক স্বহস্ত লিখিত—তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত—বিবরণটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"আমার রোগ শয্যার কথা শুনিয়া হয়তো কাহারও কিছু উপকার দর্শিত পারে, তাই ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। আমি প্রায় তুই বৎসর হইল রোগাক্রান্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে দেড় বৎসরের অধিক কাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন শয্যাতে শয়ন করিয়া আছি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কখন কখন বহু কষ্টে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উপবেশন করিতে পারি, আমার রোগ পক্ষাঘাতই বলা যায়, কেন না কটি হইতে শরীরের নিম্নভাগ সমুদায় অচল। কেবল অচল নহে ঐ অংশে যদি অগ্নিলাগান যায়, কিংবা মাংস কর্ত্তন করিয়া লওয়া যায় তবুও টের পাই না। কিন্তু আমার পক্ষাঘাত সাধারণ লোকের পক্ষাঘাতের অনুরূপ নহে। অন্যের পক্ষাঘাতে চলচ্ছক্তিমাত্র থাকে না; কিন্তু তাহারা কোন যন্ত্রণা ভোগ করে না, আমার যন্ত্রণা অসীম। আমি এই যন্ত্রণার প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। পা হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত এক প্রকার খেচুনি আছে, ইহার প্রকৃতি ঠিক মৃগীরোগের অনুরূপ। যখন আকর্ষণ করিতে থাকে তখন বোধ হয় প্রাণ যায়। তার পর শীত বোধ, জ্বালা, চিম

চিম, রিম রিম, কত প্রকার করে তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। যখন জ্বালা হয়, বোধ হয় যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে ধরিয়া রাখিয়া কেহ পোড়াইতেছে, শীত এত প্রবল, যেমন হয় যেন কেহ অনবরত বরফ ঢালিয়া দিতেছে। যেমন শীত কষ্টপ্রদ, জ্বালাও তেমনি। কখন শীত, কখন কেবল জ্বালা। কখন শীত ও জ্বালাতে মিশ্রিত এক প্রকার নির্ব্বচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়া কষ্ট দেয়।

"তার পর আমার মলমূত্রাদিপরিত্যাগের সময় বোধ নাই, অর্থাৎ ঐ সকল যন্ত্রাদিতে সাড় না থাকা প্রযুক্ত অজ্ঞাতসারে মলাদি নির্গত হইয়া পড়ে। রাত্রিতে ও দিনে ১৫। ১৬ বার প্রস্রাব হয়, ইহার প্রায় প্রত্যেক বারেই কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। ৮। ৯ খানি কাপড় কাছে থাকে। তাহাতে অনেক দিন কুলায় না। এমন কি, সমুদায় ছেঁড়া নেকড়া পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়। শীত ও বর্ষাতে ভয়ঙ্কর ক্লেশ। বর্ষাতে শীঘ্র কাপড় শুকায় না। এই জন্য কখন কখন উলঙ্গাবস্থায়ও থাকিতে হইয়াছে। শয্যাতে খাই, শয্যাতে শুই, শয্যাতে মল মূত্র ত্যাগ করি, শৌচ আচমনবর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ ক্লেশে থাকি তাহা ভগবান্ জানেন।

"ইহা ব্যতীতও সাময়িক কষ্ট যন্ত্রণা আছে। সে সকলও নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু ধন্য দয়াময় শ্রীহরি! ধন্য মা আনন্দময়ী! তাঁহার কৃপাতে আমি এই ঘোরতর দুঃখের ভিতরেও সুখী। আমি যখন প্রথম এই দুরারোগ্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তখন একদিন মনে হইয়াছিল যে, আমার যে প্রণালীর রোগ উপস্থিত হইল, যদি দীর্ঘকাল এই অবস্থায় থাকিতে হয়, জানি না কত কষ্ট পাইতে হইবে। হয়ত ঔষধ ও পথ্য পাইবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু এই কথা চিন্তা করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ মনে হইল,

কি করিলাম! এ যে ঘোরতর অবিশ্বাসের কথা!! আমি যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—তাঁহারও কোন অভাব নাই তবে আমি এমন অসঙ্গত ভাবনা ভাবিতেছি কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া সে চিন্তাকে বিদায় দিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই আমি অতি দীর্ঘকালের জন্য রোগ শয্যায় শয়ন করিলাম, সেই যে শয়ন করিলাম আর উঠিলাম না। ভক্তবৎসল ভগবান্ অল্পবিশ্বাসীকে পূর্ণ বিশ্বাসী করিবার জন্যই বোধ হয় এরূপ করিলেন। সুদীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিতেছি, কিন্তু কোন অভাব বুঝিতে পারিতেছি না। অতি বড় বড় মাননীয় চিকিৎসকগণ ক্রমাগত আমার চিকিৎসা করিতেছেন। বড় বড় রাজা জমিদারগণ অর্থ দ্বারাও সহসা যে সকল চিকিৎসক পাইতে পারেন না, আমি বিনা অর্থে সেই সকল সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছি, এবং কত জানিত অজানিত বন্ধুগণ অর্থ দান করিয়া আমার পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। যখন এই অবস্থার মধ্যেও ঔষধ ও পথ্যের তাদৃশ সুব্যবস্থার কথা চিন্তা করি, যখন ক্ষুধার সময় হইলে সুমিষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তখন সন্তানবৎসলা জননীর অপার করুণা স্মরণ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারি না। পূর্ব্বে যে অবিশ্বাসের কথা মনে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া এই সময়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

"পূর্ব্বে জ্বালা যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া কাঁদিয়াছি, ক্রমে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্যবল, বাড়িতে লাগিল। যত যন্ত্রণা বাড়ে তত যেন জননীর অমৃতপূর্ণ ক্রোড় নিকটে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে যাতনা সহ্য করিবার অধিকার জন্মিল, এবং দুঃখের ভিতরেও জননীর অভয়পদ আশ্রয় পাইব বলিয়া নিশ্চিত সংবাদ আসিতে লাগিল।

যিনি পরীক্ষা দিবার জন্য ডাকেন, পরীক্ষা সহ্য করিবার অধিকারও তিনিই দেন। তার পরে এত দূর হইয়াছে যে আমি পত্রিকাদিতে অনেক গদ্য পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া সাহায্য করিতে পারি এবং এই যন্ত্রণার মধ্যেও অনুমান ১২। ১৪ ফরমার এক খানি পুস্তকও লিখিয়াছি। পূর্ব্বে যখন সুস্থ ছিলাম আমার নিকটে কেহ কথা বার্ত্তা বলিলে আমি কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারিতাম না। সেই আমি এখন ঘোর যাতনার মধ্যেও অনেক চিন্তাপূর্ণ বিষয় লিখিয়াছি।

"তার পর মনে করুন, আমার যে অবস্থা তাহাতে প্রতিদিন মলমূত্রাদি পরিষ্কৃত হওয়া কত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমার পত্নী অপরাজিত ও অবিরক্ত চিত্তে সেই সকল পরিষ্কার ও আমার যথোচিত সেবা করিতেছেন। যদি আমার পত্নী অন্য নারীদিগের ন্যায় বিরক্তচিত্তা হইতেন, আমার দুঃখের ইয়ত্তা থাকিত না। ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ করুণা।"

"প্রতিদিন ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারি না, কেন না অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া এক ভাবে বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু স্মরণ মননাদি সর্ব্বদাই করিতে পাই, ইহাও তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। আমার রোগ ভাল হয় নাই কি হইবে না, ইহা ভাবিয়া আমার আর কোন ক্লেশ বোধ হয় না। প্রতিদিন সাত ঘণ্টা পরিশ্রম না করিয়া অন্ন খাইলে সে চোর বলিয়া গণ্য, কিন্তু আমি দুই ঘণ্টাও রীতিমত খাটিতে পারি না; অথচ আমার জন্য যথোচিত খাদ্য প্রতিদিনই জননীর কৃপায় আসিতেছে। চোর বলিয়া এক দিনও অন্নবন্ধ হয় না, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারি না। ধন্য মা আনন্দময়ী।"

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের সহিত কাকিনীয়ার জমীদার গৃহের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা আরম্ভেই আমরা বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার এই দুরারোগ্য রোগ সেই কাকিনীয়ার অত্যুৎসাহের সহিত প্রচার করিতে গিয়া উৎপন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন রায় চোধুরী যে তাঁহার ঈদৃশ পীড়ায় তাঁহার চিকিৎসার জন্য বিশেষ সাহায্য করিবেন ইহা নিরতিশয় স্বাভাবিক। তিনি নিম্ন লিখিত পত্র খানি লিখিয়া এক শত টাকা প্রচারকার্য্যালয়ে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকটে প্রেরণ করেন ;—

"কাকিনীয়া—১২৯৩ সাল, তাং ২৮ শে জ্যৈষ্ঠ।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু—

"সংবাদপত্র পাঠে ও শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকটে জানিতে পারিলাম যে, শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয় ক্রমেই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এক জন আমাদিগের চির আত্মীয় লোক, তাঁহার চিকিৎসা বিষয়ে দৃষ্টি করা আমার উচিত, এজন্য মণি অর্ডার যোগে আপনার নিকট ১০০ এক শত টাকা পাঠাইলাম, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রাপ্তি সংবাদ লিখিবেন ও এই টাকার দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইবেন। আপনি সকলের তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া আপনার হস্তে টাকা পাঠান গেল। মধ্যে মধ্যে কবিরাজ মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের সকলের দৃষ্টির জন্য ফটোগ্রাফ দুই খানা পাঠান গেল। মঙ্গলময়ের কৃপায় আমরা ভাল আছি, আগামীতে আপনাদের কুশল সমাচার বাঞ্ছনীয়। নিবেদনমিতি।

প্রণত—

শ্রীমহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।"

এই দান সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "কুমার বাহাদুরের এত গুলি টাকা দান আমরা হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি এত দয়া করিলেন কেন? স্নেহময়ী জননী তাঁহার মধ্যে থাকিয়া আমাদের এই দুঃসময়ে এই কার্য্য করিলেন, এ কথা কি আমরা স্বীকার করিব না? আমরা জানি না কি বলিয়া দাতার প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদান করিব। পত্রিকাখানি পাঠ করিবার সময় চক্ষে জল আসিল, রোগীও চক্ষে জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর কি বলিব মনে মনে দাতার চরণে প্রণাম করিতেছি। তিনি তাহা যেন গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রদত্ত এই উপকার আমরা যেন কখন বিস্মৃত না হই "

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের চিকিৎসা সম্বন্ধে এই সংবাদগুলি ধর্ম্মতত্ত্বে তৎকালে প্রকাশিত হয়:—১৬ আষাঢ়, ১৮০৮ শক—"বিদেশস্থ অনেক বন্ধু আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের পাড়ার সংবাদে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য বার বার পত্র লিখিতেছেন. এবং কেহ কেহ অর্থ দ্বারাও সাহায্য করিতেছেন, আমরা বন্ধুদিগের এই সকল সহানুভূতি ও সাহায্য জন্য বিশেষ উপকৃত ও আশ্বাসিত হইয়াছি। কবিরাজ মহাশয় এক্ষণে পাথুরিয়া ঘাটার সুবিখ্যাত কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের চিকিৎসায় আছেন। দ্বারিক বাবু বলিয়াছেন, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া শীঘ্রই তাঁহার রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন। অন্যান্য উপদ্রব কিঞ্চিৎ কম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পায়ের দৌর্ব্বল্য কিছু কমে নাই। তাঁহাকে দেখাইবার জন্য মধ্যে এক দিন ফৌজদারী বালাখানায় প্যারী-

মোহন কবিরাজ মহাশয়কেও আনা হইয়াছিল।” ১৬ শ্রাবণ,—“আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের পীড়া আজও কিছুই বিশেষ হয় নাই। সুবিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় কৃপা করিয়া ভার গ্রহণপূর্ব্বক গত পরশ্ব হইতে ঔষধ দিয়াছেন। তিনি পীড়াকে সাইটিকা জাতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। ডাক্তার সরকার মহাশয় অনেক উৎকট রোগ আরাম করিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আশা করি, এবারেও ভগবানের কৃপাতে তিনি সফলযত্ন হইবেন। কবিরাজ মহাশয়ের পীড়ার দারুণ যন্ত্রণা আর দেখা যায় না, কেবল তিনি বিশ্বাস বলে ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া সহ্য করিতেছেন।” ১৬ ভাদ্র, ১৮০৮ শক।—“সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সুচিকিৎসায় ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা যাইতেছে। যে অসহ্য জ্বালা ও বেদনা ছিল তাহার উপশান্তি হইয়াছে। অর্দ্ধবিন্দুমাত্র ঔষধের সদ্য প্রত্যক্ষ ফল জীবন্ত শক্তি দেখা গিয়াছে। মূল রোগের নিবৃত্তি সময়সাপেক্ষ।” চিকিৎসায় মূল রোগের উপশম না হইলেও প্রেরিত কালীশঙ্কর ঔষধের এই আশ্চর্য্য শক্তির পর-সময়েও অনেকবার প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রেরিত কালীশঙ্কর রোগশয্যায় শয়ান, এই অবস্থায় তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নিৰ্ম্মলাসুন্দরীর বিবাহ দিতে তিনি উদ্ব্যস্ত হন। সিরাজগঞ্জের অধীন যোকনালা গ্রামের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ স্থির হয়। পাত্র স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন, তাঁহার স্বভাব চরিত্র ভাল জানিয়া ইনি এ বিবাহে সম্মতি দান করেন। এই বিবাহে পাত্রের আত্মীয়

স্বজনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল, দেশে যে বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহা হইতেও তিনি আপাততঃ বঞ্চিত হইলেন। পণ্ডিতের কার্য্যে সামান্য আয়, ইহা দেখিয়াও ইনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। ধর্ম্মার্থ জাত্যভিমানপরিত্যাগ করিয়া পাত্র বিবাহার্থী ইহাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ১৬ই আশ্বিন এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কুমার মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী এই বিবাহে ৫০৲ টাকা এবং কুচবিহারের শ্রীমতী মহারাণী ৪০৲ টাকা সাহায্য করেন। বিবাহে দুই শত টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। ১৮ আশ্বিন নবসংহিতানুসারে ইহার নবকুমারীর নামকরণ হইয়া অমলাসুন্দরী নাম রক্ষিত হয়।

ঢাকার প্রচারকবর্গ এই সময়ে নাট্যাভিনয় করেন। নাট্যাভিনয়ে স্বর্গস্থ মহাপুরুষগণের মিলন প্রদর্শিত হয়। এই মহাপুরুষগণমধ্যে মোহম্মদ ছিলেন, ইহা দেখিয়া তত্রত্য মুসলমানগণ ক্ষেপিয়া উঠে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে কেহ কেহ চৈতন্য-লীলার অভিনয় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহা হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে কে চৈতন্য সাজিবে? আমি বলিতেছি চৈতন্য সাজিতে আমার তো সাহস ও ক্ষমতা নাই। নববিধানীর ঈশা চৈতন্যাদি সাজা গর্হিত পাপ।" এই অভিনয়োপলক্ষে ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে (১৬ আশ্বিন, ১৮০৮ শক) এই কথাগুলি প্রকাশ করিয়া ঢাকার অভিনয় "অনুকরণ ও অনুসরণ" ব্রতের বিরোধী এই ভাব তাহাতে ব্যক্ত করা হয়। অনুকরণ নয় অনুসরণ ঢাকাস্থ প্রচারকবর্গের ব্রত এই বলিয়া এ লেখার প্রতিবাদ হয়। প্রেরিত কালীশঙ্কর যাহা অসঙ্গত মনে করিতেন তাহার প্রতিবাদ না

করি।। তিনি চুপ করিয়া থাকিবার লোক নহেন, সুতরাং সেই রোগশয্যায় থাকিয়াই "অনুকরণ ও অনুসরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ তিনি লিখেন। প্রবন্ধের মতের সহিত কাহার কত দূর মিলে তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া তিনি আপনি কি ছিলেন তাহা ইহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া আমরা উহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"অনুকরণ ব্যতীত অনুসরণ সিদ্ধ হয় না আমরা এ প্রস্তাবে তাহাই প্রদর্শন করিব। তাহা করিতে হইলে অগ্রে অনুকরণ ও অনুসরণ বস্তুটা কি, নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। অনুপূর্ব্বক 'কৃ ধাতু' অনট্ করিয়া অনুকরণ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ এই, অনু শব্দ পশ্চাদ্বাচক, করণ শব্দ কার্য্য বা অনুষ্ঠানবাচক, উভয়কে মিলাইয়া পূর্ব্বানুষ্ঠাতার পশ্চাতে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করাকে অনুকরণ বলা যায়। আর অনুপূর্ব্বক 'সৃ ধাতু' অনট্ করিয়া অনুসরণ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহারও অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, সরণ বলিতে গমন বুঝায়। উভয়কে মিলাইয়া পশ্চাদগমন এই অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। অনুকরণ কার্য্য দ্বারা, অনুসরণ গতি দ্বারা, অর্থাৎ পূর্ব্বানুষ্ঠাতা বা পথ প্রদর্শক যে যে কার্য্য করিয়াছেন এবং সেই সেই অনুষ্ঠান দ্বারা যে যে গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া, সেই সকল কার্য্যের অনুকরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাতে অগ্রসর হওয়াকে অনুসরণ বলা যায়। সুতরাং অনুকরণ না করিলে অনুসরণ সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ পথপ্রদর্শকের গতি লাভ করা যায় না। একই গৃহে আরোহণ করিবার জন্য ক্রমোন্নত দুইটি সোপান, একটি অনুকরণ, দ্বিতীয়টি অনুসরণ।

"আমি যাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছি, তিনি যে যে কার্য্য করিতেন আমিও যদি পরে তাঁহাকে আদর্শ করিয়া সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে তাঁহার অনুকরণ করিলাম। আচার্য্য উপাসনা করিতেন, তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেখিয়া, তিনি উপাসনা কালে যেরূপ সরল সুমিষ্ট ভক্তিরসপূর্ণ বাক্য বলিতেন, তিনি অন্তরে বাহিরে যেরূপ পবিত্রাতা রক্ষা করিতেন, যদি সেইরূপ করিয়া আমিও উপাসনা করি, তাহা হইলেই আমি অনুকরণ করিলাম। সমুদায় বিধানবাদী ব্রাহ্ম এই অনুকরণ করিয়াই উন্নত হইয়াছে। কেন না কিরূপে উপাসনা করিতে হয়, উপাসনার কয়টী অঙ্গ থাকা উচিত, সেই সকল অঙ্গ থাকিবার প্রয়োজন কি, কি ভাবে ইষ্ট দেবতার নিকটে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, কেমন অকৃত্রিম ভাবে হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া পরমেশ্বরকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত, পূর্ব্বে এ সকল কেহ জানিত না। পরে আচার্য্যের উপাসনা প্রণালী দেখিয়া ও শুনিয়া, আচার্য্যের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিয়া আমরা উপাসনা করিতে শিখিয়াছি এবং সেই ভাবে আপন জীবনকে উপাসনাশীল করিতে যত্ন করিতেছি। তিনি দীর্ঘকাল ধ্যান করিতেন, আমরাও ধ্যান করি, তিনি আরাধনা করিতেন বলিয়া আমরাও সেই ভাবে আরাধনা করি। তিনি প্রার্থনা করিতেন, কৃতজ্ঞতা দান করিতেন বলিয়া আমরাও করি।

"আচার্য্য ভোজনকালে ভোজ্য অন্নের ভিতর শক্তিরূপা আনন্দময়ী জননীর জীবন্ত হস্ত দর্শন করিতেন এবং তাঁহার স্পর্শে অন্নের পবিত্রতা চিন্তা করিতেন। পরে সাধু ভক্তদিগের চরিত্ররূপ

রক্ত মাংস বলিয়া সেই অন্ন ভোজন করিতেন। আমরাও এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার অনুকরণ করি। তিনি জলের ভিতরে পাপপ্রক্ষালনকারিণী সাক্ষাৎ মাতৃশক্তির আবির্ভাব দর্শন করিয়া সেই জলে স্নান করিতেন বলিয়া আমরাও সেই ভাবে সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তাহার অনুকরণ করি। তিনি পত্নীর সহিত শারীরিক সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন তাই দেখিয়া আমরাও সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। তিনি অন্নে বস্ত্রে গৃহে ও গৃহসজ্জাতে শ্রীহরিকে নিত্য বর্ত্তমান দেখিতেন বলিয়া আমরাও আমাদিগের আবাস-ভবনকে হরিমন্দির করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমরা তাঁহার অনুকরণ করি কেন, তিনি অগ্রে এই সকল কার্য্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাকে করিতে দেখিয়া পরে তাঁহার অনুকরণ করিতেছি কেন? তাঁহার অনুকরণকারী অর্থাৎ পশ্চাদ্গামী হইবার আশঙ্কায়, যদি অনুকরণ না করি, অনুকরণ করা যদি নববিধান বিরুদ্ধ হয় তবে আমা-দিগের সমুদায় গৌরব চূর্ণ হইয়া যায়। তিনি উপাসনা করিয়াছেন আমরা উপাসনা করিলে তাঁহার অনুকরণ করা হইবে বলিয়া যদি উপাসনা না করি, তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুকরণ ভয়ে যদি আমরা বক্তৃতা না করি, তাঁহার কথা তাঁহার আচার ব্যবহার যদি আমরা নিজ নিজ জীবনে, বক্তৃতাতে প্রচারক্ষেত্রে উদ্ধৃত না করি, তবে কদাচ আমরা তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি না। ফলতঃ তিনি উপাসনা করিয়া ঈশ্বরদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে জীবনকে নিয়মিত করিয়াছিলেন, সেই উপাসনা না করিয়া আমরা কদাচ সেই

ঈশ্বরদর্শন লাভ ও তাঁহার বাণী শ্রবণে অধিকারী হইতে পারি না। এখন যাঁহারা বড় বড় সাধু, আচার্য্য কর্তৃক ঈশ্বরদর্শন ও ঐশী বাণী শ্রবণের পূর্ব্বে তাঁহারা কেহ কখন নিরাকার ঈশ্বরের দর্শন ও নিরাকার ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করা যায় ইহা জানিতেন না ও বুঝিতেন না, এবং তাঁহার দর্শন শ্রবণ ব্যতীত জীবনের গতি যে ফেরে না, দুরবস্থা যে ঘোচে না তাহাও কেহ জনিতেন না। কাজেই ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে অধুনাতন সাধুদিগের দর্শন শ্রবণ আচার্য্যদেবের অনুকরণ। এই অনুকরণ করিয়াই অনেকে নবজীবন লাভ করিয়াছেন। কেন না ঈশ্বরদর্শন না পাইলে ও তাঁহার বাণী শ্রবণে প্রকৃত অধিকার না জন্মিলে জীবনে নববিধান ফলে না, এই স্থানে ইহাও স্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে যে, আমাদিগের জীবনে নববিধান প্রতিফলিত হওয়া একমাত্র অনুকরণের ফল। ঈশ্বরাজ্ঞা হইতে, তাঁহার ইঙ্গিত বা বিধি হইতে জীবনে যে নবতর স্বর্গীয়তা উপস্থিত হয় তাহারই নাম নববিধান। অনুকরণ ইহার বিরোধী নহে, প্রত্যুত অনুকরণ না করিয়া আমরা কেহ এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই! এমন একটিও লোক আমরা দেখি নাই, যিনি আচার্য্যের উপাসনাপ্রণালী না দেখিয়া তাঁহার নিকট উপাসনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা না শুনিয়া এইরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীর উপাসনা করিয়াছেন। সুতরাং অনুকরণ দ্বারাই আমরা নববিধান লাভ করিয়াছি ও করিতেছি এ কথা সত্য।

"অনুকরণ না করিলে অনুসরণে অধিকার জন্মে না কেন, তাহাই বলা যাইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনুকরণ কার্য্য দ্বারা, আর অনুসরণ গতি দ্বারা। সেইরূপ কার্য্য, সেই অনুষ্ঠাতা

আচার্য্য বা পথ প্রদর্শকের অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল দ্বারা তাঁহার অনুসরণ না করিলে তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমনে অধিকার জন্মে না; তিনি যাহা যাহা দর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ ভক্তি বিশ্বাস উপার্জ্জন করিয়া সেইরূপ অনুষ্ঠাতা হইতে না পারিলে, সেই ভাবে অটল অবিচলিত থাকিয়া ধ্যান করিতে না পারিলে, সেইরূপ সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা করিতে না পারিলে ঈশ্বরলাভ হয় না, মহাযোগ মহাভাবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সাধু ভক্তদিগকে চেনা যায় না। এই জন্য মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, 'আমিই একমাত্র পথ, যে আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহে সে চোর।' এই চৌর্য্যের প্রাচুর্য্য এখন অনেক স্থানেই দেখা যায়। কেন না ঈশার আচরিত কার্য্য সকল না করিয়া কেহ ঈশার গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু দুঃখের সংবাদ এই যে, অনেকের মস্তকে ধর্ম্মাভিমান প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এরূপ বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাঁহারা আপন আপন হৃদয়মূলে যৌবনসুলভ নানাপ্রকার সাংসারিকতা ও চতুরতা লুকাইয়া রাখিয়াও আপনাদিগকে স্বর্গের শিশু বলিয়া ব্যক্ত করেন এবং অপর ভক্তমণ্ডলীকে অভক্ত বলিয়া হেয়জ্ঞান করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

"কার্য্য না করিয়া গতিলাভ করা যায় না এইটি আমাদিগের প্রস্তাব। আচার্য্য অন্ন জলের ভিতরে দিব্য শক্তি দর্শন করিয়া এবং সেই অন্নজল সাধুভক্তদিগের রক্তমাংস জানিয়া পান ভোজন করিয়া নিজের রক্ত মাংস পবিত্র করিয়াছিলেন, মানুষের মনে যে সকল কামক্রোধ প্রভৃতি অসুর বাস করিয়া মানবদেহের রক্ত

মাংস কলুষিত করে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার অনুকরণ করিয়া নিজ নিজ দেহের রক্ত মাংস পবিত্র করিতে চাই। যদি পারি আমরা আচার্য্যের অনুসরণ করিলাম; অর্থাৎ আচার্য্য যে কার্য্য করিয়া যে গতিলাভ করিয়াছিলেন, আমরাও সেই কার্য্য করিয়া সেই গতি লাভ করিলাম।

"তিনি তীর্থযাত্রা করিতেন, আমরাও করি তাঁহার তীর্থযাত্রার ফললাভ করিবার জন্য। তিনি ঈশা মুশা মোহম্মদ সক্রেটিস প্রভৃতির নিকটে যে ভাবে গমন করিতেন সেই ভাবটি জীবনে আয়ত্ত না করিয়া কদাচ আমরা ঐ সকল মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করিতে পারি না। সেই সকল মহাজীবনের সঙ্গে মিলিতে চাহিলে সেই সেই জীবনের ন্যায় বিশুদ্ধ হইতে হইবে নতুবা মিশা যাইবে না। আমরা যদি একটি সামান্য কণ্টকের আঘাত সহ্য করিতে না পারি, লোকের একটী বক্রোক্তি শ্রবণ করিয়া যদি ক্রোধে অধীর হই, তবে কি ক্রুশে আত্মবিসর্জ্জনকারী ঈশার সঙ্গলাভ করিতে পারি? তৈলও তরল জলও তরল হইলেও তৈলে জল মিলে না। সেই প্রকার ঈশাও মানুষ আমিও মানুষ হইলেও দুইটীতে মিলন অসম্ভব। এই জন্য সাধনের প্রয়োজন। যোগবল লাভ করিতে পারিলে, কার্য্যকুশল হইতে পারিলে জলের সঙ্গে তৈল মিলান যায়। তুমি আমি জানি না জলে তৈল কেমন করিয়া মিলে কিন্তু একজন রসায়নবিৎ যোগনিপুণকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি উপায় করিয়া অতি সহজে এই কার্য্য সাধন করিবেন। এই জন্য বলা হইয়াছে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।' আচার্য্যের কার্য্য, আচার্য্যের আচর্য্য আচরণ না করিয়া সুতরাং তাঁহার অনুকরণ না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি না।

আচার্য্য শব্দের অর্থ কি পাঠক জান? আচার্য্য অর্থে আচরণীয়; আচার শব্দে ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া আচার্য্য হইয়াছে। ইহার অর্থ অনুসরণের আদর্শ, অর্থাৎ আপন জীবনে আচরণ করিয়া তিনি যাহা দেখাইয়া দেন শিষ্য পরে সেই কার্য্যের অনুকরণ করে বলিয়া 'তাঁহার নাম আচার্য্য'। ইহা দ্বারা অতি সহজেই বোধগম্য হইবে যে অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করিতে পারি না।" যে নাট্যাভিনয়ের উপলক্ষে তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন, তাহাতে যে অনুকরণও হয় নাই অনুসরণও হয় নাই সেইটি প্রতিপন্ন করিয়া তিনি ইহার উপসংহার করিয়াছেন।

এই 'অনুকরণ ও অনুসরণ' প্রবন্ধের অপূর্ণতা দোষনিরসনের জন্য ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন, "অনুকরণ আমাদিগের ধর্ম্মে আমরা অধর্ম্ম মনে করিয়া মানি, কেন না সাধারণতঃ অনুকরণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার অর্থ একজন মানুষ যাহা করিতেছে, আর এক জন বাহ্যতঃ ঠিক তাহাই করিতে যত্ন করিতেছে। বাহ্য ভাবে কোন মানুষের অনুকরণ করিতে গেলেই ঈশ্বরের অনুকরণ হইল না, সুতরাং আমাদের ধর্ম্মের বিরোধী হইল। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, 'আমার পিতা এখনও কার্য্য করিতেছেন, আমি কার্য্য করিব না?' এখানে তিনি কি করিলেন? পিতার অনুকরণ করিলেন। পিতা কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তিনিও কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিলেন। এরূপ অনুকরণ করিবার সামর্থ্য মানুষের নিজের নাই, পবিত্রাত্মা ঈদৃশ সামর্থ্য অর্পণ করেন। অনুসরণ অনুকরণ দুই ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ হইলেও মূলার্থে ইহারা এক। কেন না আমি ঈশ্বরের অনুসরণ করি, তাহার অর্থ এই, তিনি যাহা করেন আমি তাহাই করি। অনুসরণ বা অনুকরণ

যেখানে পবিত্রাত্মার প্রণোদনভিন্ন হয়, সেখানে অযুক্তধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। আমরা পবিত্রাত্মার সহায়তায় যখন ঈশ্বরের অনুসরণ বা অনুকরণ করি, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাজন গণের অনুসরণ ও অনুকরণ আপনা হইতে সঙ্ঘটিত হয়। কেন সঙ্ঘটিত হয়, না তখন আমাদিগেতে পুত্রত্বাদি প্রস্ফুটিত হইয়া সেই সেই মহাজনগণের সঙ্গে আমরা এক হইয়া যাই। সুতরাং বলিতে পারা যায় আমরা তখন সেই সেই মহাজনের একটী একটী ক্ষুদ্র অনুকৃতি বা প্রতিকৃতি। আমরা যখন বলি আচার্য্যের অনুসরণ ও অনুকরণ, তখন এই দুই শব্দকে অভিন্নার্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কেন না অনুসরণ বা অনুকরণ্ বাহ্য নহে আধ্যাত্মিক। তবে এখানে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, অনুসরণ ও অনুকরণে আমরা পবিত্রাত্মার হস্তধারণ করিয়া চলি, কেন না তাঁহা না হইলে এক জনের আত্মা অপরের আত্মার অনুসরণ করিতে পারে না। পবিত্রাত্মার হস্তধারণ ঈশ্বরের হস্তধারণ এক ও অভিন্ন। ঈশ্বরের হস্তধারণ করিলে তিনিই মহাজনগণের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, অন্যথা অনুসরণ বা অনুকরণ হয় না, এই আধ্যাত্মিক অখণ্ড্য নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমরা কাহাকেও কোন দিন অনুসরণ বা অনুকরণ করিতে বলি নাই বলিব না, এবং যখনই অনুসরণ বা অনুকরণের কথা উঠিবে এই অর্থে সকলে তাহা গ্রহণ করিবেন, আমরা অনুরোধ করি।"

প্রেরিত কালীশঙ্করের আচার্য্য কেশবচন্দ্রে কি প্রকার বিশ্বাস ছিল ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত (১৮০৯ শক, ১ চৈত্র) এই প্রবন্ধটিতে তাহা অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায় :—

"একমেব সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি বহুনির্গুণাঃ।

একহীনা ন শোভন্তে যথা সংখ্যাঙ্কবিন্দবঃ॥"

"যেমন সংখ্যাবাচক '১' এই রাশির উপরে যত শূন্য সন্নিবিষ্ট হইবে, ততই তাহার বহুগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু '১' এই রাশির অভাব হইলে কেবল শূন্যমাত্রের আর কোন মূল্য ও শোভা থাকে না, সেইরূপ এ সংসারে এককে আশ্রয় করিয়া অনেক নির্গুণ গুণবন্তের ন্যায় প্রকাশ পায়, একের অভাব হইলে তাহাদিগের তাদৃশ শোভা ও মূল্য আর থাকে না।

"আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর এই বাক্যটিকে আমরা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ করিলাম। আমরা কিছুই নহি, আমরা মূল্যবিহীন শূন্যমাত্র। ঈশ্বর প্রসাদে তিনি বস্তুরূপে আশ্রয়রূপে আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে শোভাযুক্ত ও মূল্যবান্ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে হারাইয়া আমাদিগের দুর্গতির সীমা নাই। তিনি আমাদিগের জীবিকা ও জীবন ছিলেন, আমরা তাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত ছিলাম। জীবিকা ও জীবনের অভাবে জীবিত যেমন আর জীবিত থাকিতে পারে না, আমাদিগের দশা তাহাই ঘটিয়াছে। আমরা জীবনসত্ত্বেও মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি, সসার হইয়াও অসারবৎ প্রতিপন্ন হইতেছি। আমরা যে অসার অপদার্থ পদে পদে তাহার পরিচয় দিলাম। আমাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় তিনি কত বড় তাহা আর এখন বুঝিতে পারা যায় না। কেন না এক জনের অভাবে সকলেরই মূল্য সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টির প্রাবল্য হইতে আমাদিগের এই শোচনীয় দশা উপস্থিত। 'তিনি আমাদিগের নিত্যকালের

অনন্তকালের জীবনসঙ্গী, তাঁহা হইতে বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব অসাধ্য।' এই বিশ্বাসের অদৃঢ় ভাব হইতেই আমাদিগের ঈদৃশ দশা ঘটিয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছাতে আমাদিগের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইয়াছে, এই যোগের ভিতরে আমাদিগের ও জগতের পরিত্রাণের বীজ মন্ত্র গুপ্তভাবে বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে। এ বিশ্বাস যদি আমাদিগের দৃঢ়তর হইত, আমরা কদাচ তাঁহার শাসনে (শিক্ষাতে) অগ্রাহ্য বা অনাদর করিতে সমর্থ হইতাম না। মিথ্যাদৃষ্টির প্রাবল্য-হেতু জীবনে অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে এবং তাহা হইতেই আচার্য্যের উক্তি ও আচরণের মধ্যে দেবপ্রভাব অনুভব করিতে আমাদিগের বাধা জন্মে। অহঙ্কারের বল মিশ্রিত থাকাতে এই বাধা সত্যের ও ন্যায়ের কল্পিতচ্ছবিরূপে প্রতিভাত হয়, তাই আমরা ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতে অসমর্থ হই, এবং ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের প্রদত্ত শাসন (শিক্ষা) হইতে স্খলিত বা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি।

"যখন আমরা অন্যের অনুরাগের আশা করি, তখন আমি, তাঁহার বাল্যসঙ্গী, চিরসঙ্গী, আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা, আমার প্রতি তাঁহার অমুক কার্য্যের ভার অমুক কার্য্যের ভার' ইত্যাদি কথা দ্বারা লোকের অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করি। কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয় বলপূর্ণ শাসন গ্রহণ করিয়া জীবন গঠন করিতে যত্ন করি না, এবং একবারও ভাবি না যে যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনিত কেবল মৌখিক ভালবাসাতে আপ্যায়িত নহেন। জীবন দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে তাঁহার প্রীতিভাজন হইবার আশা

নাই। এ কথা ভাবি না, বুঝি না কেন? মিথ্যাদৃষ্টির জন্য বা অহঙ্কারের জন্য। অহঙ্কারের বল বৃদ্ধি হইলে আপনাকেই সর্ব্ব বিষয়ে সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং আচার্য্যশাসনে দেব-নিঃশ্বসিত অনুভব করিয়া তাহার আনুগত্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যখন আচার্য্য স্বর্গগামী হইলেন তখন হইতেই আমাদিগের উপর অহঙ্কাররূপী শয়তানের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই সকলে স্বপ্রধান হইয়া আপন আপন রুচির অনুসরণ করিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, কেন না এ পথে কৃতকার্য্যতা নাই। যদি আমরা আপন আপন রুচির বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছাকল্পিত পথে চলিতে চেষ্টা না করিতাম, এবং আচার্য্যদেবকে (তাঁহার শরীরাবস্থানকালে যেরূপ করিয়াছি) মধ্যবিন্দু করিয়া তাঁহারি শাসন গ্রহণ করিতাম, তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে যদি চলিতে পারিতাম, তিনি সশরীরে কোন কথা বলিলে যেমন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতাম, শরীরত্যাগের পরেও যদি সেইরূপে সমাদর করিয়া জীবনগঠনের চেষ্টা করিতাম, কদাচ আমাদিগের মধ্যে অমিলন অসদ্ভাব স্থান পাইতে পারিত না। সমাজ, দল, প্রেরিত, গৃহস্থ, বৈরাগী, সাধক প্রভৃতি সকলেই প্রায় উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতে চলিলেন। যত দিন যাইতেছে তত অধোগমন বাড়িতেছে, কিন্তু কাহারও চেতনা হইতেছে না। যেমন মাদকসেবী অন্যের হিতোপদেশ শুনিয়া কিংবা দৃষ্টান্ত দেখিয়া চেতনাপ্রাপ্ত হয় না, সে কদাচ মাদকসেবনরূপ নিত্যকৃত্য পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ সংসারমদে মত্ত হইয়া আমরাও চেতনাহীন হইয়াছি। আপন শোচনীয় ভাব প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।

"এখনও সময় আছে, বিন্দু সকল চেতনাবিহীন, চেষ্টাবিহীন তাই তাহারা চেষ্টা করিয়া রাশির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু মানুষ সচেতন ও সচেষ্ট। ইচ্ছা করিলেই চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার রাশি বা আশ্রয় লাভ করিতে পারে। সে চেষ্টা যদি মেষদলের চেষ্টার ন্যায় সরল ও শীলতাপূর্ণ চেষ্টা হয়, অবশ্যই ফল তো হইবে, কিন্তু চতুর সংশয়ী বৃকের ন্যায় চেষ্টা করিলে সফল হওয়া অসম্ভব। এখনও যদি আমাদিগের মণ্ডলীর বন্ধুগণ সচেতন হইয়া প্রকৃত কল্যাণের পথে পদার্পণ না করেন তবে যে তাঁহাদিগের পরিণাম আর ভয়াবহ হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই যিনি এই প্রস্তাবের লেখক তিনিও এই মণ্ডলীভুক্ত এক জন — সুতরাং তিনি কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন না। তাঁহার আন্তরিক সরল অভিলাষ এই যে বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিতভাবে চিরসঙ্গী আচার্য্যদেবকে জীবনে গ্রহণ করিয়া সুখী হন, কিন্তু বন্ধুবর্গের আনুকূল্য ব্যতীত এ আশা সফল হওয়া অসম্ভব। তাই সে বিনীত প্রার্থনা করিতেছে যে, স্ব স্ব রুচি পরিত্যাগ করিয়া সকলেই আচার্য্য দেবের আজ্ঞার অনুসরণ করুন। ইহা লেখকেরও নহে, পাঠকেরও নহে, কিন্তু আচার্য্যের আজ্ঞা। সুতরাং লেখকের বটে পাঠকের বটে। ইহার জন্য লিখক দায়ী ও পাঠকও দায়ী। এই আজ্ঞা পালন করিলে লিখক, পাঠক ও জগৎ সকলেরই কল্যাণ হইবে নিশ্চয়। অবমাননা বা অনাদর করিলে যাহা হইবে তাহাও প্রত্যক্ষ। পাঠক যদি তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং তাহা যদি তাঁহার প্রাণগত ধ্রুব বিশ্বাস হয়, আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবেন না। যদি মনে করিয়া থাকেন যে আপন মনঃকল্পিত পথে

চলিলেই জয়ী হইতে পারিবেন, তাহা বড়ই দুরাশা। কেন না ৪ বৎসর চেষ্টা করিয়া কেবল অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হস্তগত, হয় নাই। এখনও চেষ্টা করিলে আমাদিগের অকল্যাণ চলিয়া যাইতে পারে, অতএব সাহসে নির্ভর করিয়া কল্যাণের পথ আচার্য্যদেবের উপদেশ গ্রহণ করুন। ইহা করিলে অন্তের মতে চলা হইবে না, কিন্তু এতকাল দ্বিরুক্তি না করিয়া যাঁহার মতে চলিয়াছি, সেই আচার্য্যদেবের মতেই চলা হইবে।"

কেহ দ্বিরুক্তি না করিয়া এত কাল আচার্য্যের মতে চলিয়াছেন এরূপ মনে করা প্রেরিত কালীশঙ্করের ভুল হইয়াছে। আচার্য্য দেহে থাকিতে এ সম্বন্ধে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন। 'আচার্য্যের আজ্ঞা পালন' এ কথা শুনিয়া অনেকেরই মনে হইতে পারে যে ইনি নববিধানধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। "আচার্য্যশাসনে দেবনিঃশ্বসিত অনুভব" এ কথাগুলি যদি এই প্রবন্ধে না থাকিত তাহা হইলে 'আচার্য্যের আজ্ঞাপালন' কথাটা বাস্তবিকই নিতান্ত সদোষ হইত। যাহা হউক তাঁহার শরীরের অবস্থা দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিয়াছেন (১৮১০ শক, ১৬ জ্যৈষ্ঠ) "ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই বিশেষ নহে, বরং পদদ্বয় ক্রমেই আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিতেছে। এতাধিক সাড়হীন যে রাত্রিতে আরসুলা পায়ে মাংস কাটিয়া লইয়া গেলেও তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁহার বাহিরের অবস্থা দেখিলে নিতান্তই কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু দয়াময় হরির কি বিচিত্র মহিমা, তিনি তাঁহার এই দুর্ব্বল রুগ্ন সন্তানের মনে আশ্চর্য্য বল বিধান করিয়া তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সুখী রাখিয়াছেন। আমাদের

ভ্রাতা এ অবস্থাতেও প্রবন্ধ লেখা এবং প্রুফ প্রভৃতি দেখিয়া দিয়া পত্রিকাদি প্রকাশের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।" ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজের তৃতীয় খণ্ড ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে ক্রমে প্রকাশ পায়, এখন উহার চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইতে থাকে। এ সকলের প্রুফ তিনি আপনি দেখিয়া দিতেন।

১৫ আষাঢ় (১৮১১ শক) প্রেরিত কালীশঙ্কর এই অবস্থায় ফুলবাড়ীর বন্ধুগণের সেবার্থ তথায় গমন করেন। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মতত্ত্বে এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ;—"ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ তিন বৎসর কাল রোগশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এই কালের মধ্যে তিনি তাঁহার দারুণ রোগযন্ত্রণা সত্ত্বেও ভগবানের কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। একটু সুস্থতা বোধ করিলেই তিনি পুস্তক, ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরিচারিকার লেখা দিয়া এবং তাঁহাকে যাঁহারা দেখিতে আসিতেন উৎসাহের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন সৎপ্রসঙ্গ এবং সদুপদেশ দান করিয়া মণ্ডলীর বিশেষ সেবা করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে কিছু দিন বিদেশে যাইয়া বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদিগের আত্মার সেবা করেন। তাঁহার এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য গত কল্য তিনি দিনাজপুর জিলার অধীন ফুলবাড়ীনামক স্থানে গমন করিয়াছেন। সেখানকার ভ্রাতারা সকলেই অনেকদিন হইতে তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও আন্তরিক ইচ্ছা যে তাঁহারা সপরিবারে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য কবিরাজ মহাশয়ের এই সময়ে সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ভ্রাতারা অতি আগ্রহের সহিত আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাইকে সপরিবারে তথায় লইয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে পরস্পরের সেবাতে পরস্পর উপকার লাভ করুন, এবং সকলের মন দয়াময়ের স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হউক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা ” ফুলবাড়ীতে গিয়া ইনি অনলস ভাবে ভগবানের কার্য্য করিয়াছেন। এই অবস্থায় ৩০।৩১ ভাদ্র উৎসবকার্য্য পর্য্যন্ত সম্পন্ন করেন। এই উৎসবসম্বন্ধে তত্রত্য একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "বিগত ৩০।৩১ ভাদ্র অত্রত্য ফুলবাড়ী নববিধান সমাজের দশম সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রেরিত ভ্রাতা কালীশঙ্কর দাস মহাশয় উপাসনা করিয়াছেন এবং জ্বলন্ত উপদেশ দ্বারা সকলের হৃদয় বিশিষ্টরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। উৎসবে রঙ্গপুর, সৈদপুর, ও নিলফামারি হইতে বিশ্বাসী ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। আনন্দময়ীর কৃপায় উৎসবে বেশ আনন্দলাভ করা গিয়াছে।" ৬ আশ্বিন ইনি ফুলবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। ফুলবাড়ী সমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ চৌধুরী ধর্ম্মতত্ত্বের জন্য ৭ আশ্বিন যে পত্রিকা লিখিয়া প্রেরণ করেন, তৎপাঠে সকলে অবগত হইবেন প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস তথায় কিরূপ উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্য সাধন করিয়াছেন।

"প্রেরিত ভ্রাতা কালীশঙ্কর দাস মহাশয় বিগত আষাঢ় মাস হইতে ৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত সপরিবারে অত্র ফুলবাড়ীতে অবস্থিতি করিয়াছেন। এখানকার নববিধান সমাজে প্রতি শুক্রবার সামাজিক উপাসনা ও প্রতি মঙ্গলবার সঙ্গীত সভা হইয়া থাকে। প্রেরিত ভ্রাতা বিশেষ প্রতিবন্ধক ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক উপাসনায় ও সঙ্গীতে স্বয়ং উপাসনা ও উপদেশ প্রদান ও আলোচনা দ্বারা সকলের মনোমালিন্য দূর এবং অনেক পরিমাণে সকলকে ঈশ্বরের

দিকে অগ্রসর করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পরিবারের ভিতরেও তিনি যে কাজ করিয়াছেন তাহা আরও আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক। বৃদ্ধারাও তাঁহাদের চির সংস্কার অনেক পরিমাণে পরিত্যাগ করিয়া রীতিমত উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন, এবং প্রতিদিন বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রেরিত ভ্রাতার নিকট সৎপ্রসঙ্গাদি শ্রবণ ও আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইয়াছেন। উক্ত ভ্রাতা রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াই জ্বলন্ত উৎসাহ ও তেজের ত্রুটি করেন নাই, সময় সময় অপরের সাহায্যে অন্যান্য বাড়ীর পরিবারের ভিতর গিয়া উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের চিত্ত তাঁহার প্রতি এত আকর্ষিত হইয়াছিল যে, মুহূর্ত্তকালও তাঁহাকে একাকী নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে দেখা যায় নাই। কেহ না কেহ সদুপদেশ পাইবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন, তিনিও প্রসন্নচিত্তে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার রোগশয্যায় প্রসন্ন ও গম্ভীর মূর্ত্তি ও জ্বলন্ত উৎসাহ ও তেজ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত বাহিরের লোকেও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন, এবং অনেক সময় সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের স্ত্রী ও পরিবারের ভিতর অনেক সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গত কল্য রজনীতে তাঁহাকে সপরিবারে কলিকাতায় রওয়ানা করিয়া দিয়া আমরা সকলেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি।"

ইঁহাদের সহিত প্রেরিত কালীশঙ্করের কি প্রকার সম্বন্ধ এই পত্রের এই কয়েক পংক্তিতে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়;— "এই ফুলবাড়ী একদিন নরক হইতেও ঘৃণিত ছিল। আমরা সকলে এক একটি মূর্ত্তিমান্ পাপ ছিলাম। যে সময়ে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে

হরিনামসুধা বিতরণ করেন ; সেই সময়ে জগাই মাধাইয়ের সমান পাপী আর ছিল না, তাই তাঁহাদের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। বর্ত্তমান জগতে সেরূপ পাপীর অভাব নাই, কাজেই গোলে পড়িয়া আমাদের নাম লুক্কায়িত ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কোন অংশেই জগাই মাধই অপেক্ষা ন্যূন ছিলাম না। সেই দুঃসময়ে সেই ঘোর ব্যাভিচারের সময়ে এই প্রেরিত ভ্রাতা কালীশঙ্কর সন্তাই আমাদের পক্ষে নিত্যানন্দ ঠাকুর হইয়া ফুলবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। আমরা যদিও তাঁহাকে প্রকৃত কলসীর কাণা মারি নাই,কিন্তু প্রকারান্তরে ব্যভিচাররূপ কলসীর কাণা মারিবার চেষ্টা করিতে ক্রটী করি নাই। কিন্তু তাঁহার অটল বিশ্বাস ও অগাধ প্রেমের নিকট আমরা পরাস্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার শরণাপন্ন হই। ইনিই আমাদের সামাজিক উপাসনামন্দির,ব্যবস্থা ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। ইহার চেষ্টায় আমাদের ভিতর যে বিধানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, ভগবান্ তাহাতে ঘৃতাহুতি দিবার জন্যই পুনরায় এই শুভ মিলন করাইয়া দিলেন। আনন্দময়ী জননী তোমার ইচ্ছার জয় হউক। সেই জগাই মাধাইয়ের ন্যায় প্রেম ভক্তি আমাদের ভিতরেও সঞ্চারিত হউক।"

ফুলবাড়ীতে ইনি যে সকল উপদেশ দেন তন্মধ্যে এই একটি ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায় :—"বন্ধুগণ, অদ্য আমি আপনাদিগের নিকট একটি নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিব। দয়াময় হরি কৃপা করিয়া এই নূতন সংবাদটি আমায় প্রদান করিলেন, এই নূতন সুধা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন, এ বস্তু আপনাদিগকে না দিয়া আমি একাকী ভোগ করিলে অপরাধী হইব। আপনারা আমার বন্ধু. আপনাদিগকে ভালবাসি,

আপনাদিগকে না দিয়া মিষ্ট বস্তু ভোগ করিলে নিশ্চয় অপরাধ। তাই এই নূতন তত্ত্বটি আপমাদের গোচর করিতেছি। নূতন তত্ত্ব কি? মিলনের তত্ত্ব সমন্বয়ের তত্ত্ব। আপনারা নববিধান বিশ্বাসী, নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম্ম, সুতরাং সমন্বয়ের সংবাদ আপনাদিগের অবিদিত নাই। আপনারা শুনিয়াছেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় আছে। কিন্তু সেই সমন্বয় কিরূপ, ইহাদিগের পরস্পরের সঙ্গে কেমন অকাট্য সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে তাহা আপনারা শুনিতে পান নাই। অতএব আমি জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম পরস্পরের সমন্বয় কিরূপ তাহার কথা আপনাদিগকে বলিতেছি।

"আগে জ্ঞানের স্বভাব কি তাহার প্রতি মনোযোগ দান করুন। জ্ঞান সত্য মিথ্যা ভাবাভাব লাভালাভ প্রকাশ করে। জ্ঞান বস্তু আলোক, প্রকাশ করাই আলোকের স্বভাব। এইটি ইষ্ট এইটি অনিষ্ট, এইটি ভাল এইটি মন্দ, এইটি সুশ্রী এইটি বিশ্রী আলোক আসিলেই আমরা বুঝিতে পারি। আলোক যে কেবল সদ্বস্তু প্রকাশ করে তাহা নহে, অসদ্বস্তুও প্রকাশ করে। আলোকের বলেই আমরা ভাল মন্দ চিনিতে পারি। তার পর ভক্তির প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। ভক্তির স্বভাব অনুরাগ প্রকাশ করা। সত্য সুন্দর মঙ্গল বস্তু দেখিলেই ভক্তি অনুরাগ প্রকাশ করে। অনুরাগ প্রকাশ কি? সেই সুন্দর বস্তুটি চায়। সেই বস্তু আপনার করিয়া লইবার জন্য ভক্তি যত্ন প্রকাশ করে। যখন জ্ঞান আসিয়া আলোক আসিয়া অন্ধকার সরাইয়া দিল, তখন তাহার ভিতরকার বস্তু (সত্য মিথ্যা) বাহির হইয়া পড়িল। ভক্তি তখন সত্যটি লইয়া অসত্যটি পরিত্যাগ করে, সুরূপটি

লইয়া কুরূপটি পরিত্যাগ করে। এইটি ভক্তির কার্য্য। আবার ভক্তি কর্ত্তৃক সত্য গৃহীত হইলেই কর্ম্ম তাহার ফলরূপে আবির্ভূত হয়। জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করা, কিন্তু ভক্তির গ্রহণী শক্তি ব্যতীত প্রকাশ অকর্ম্মণ্য। জ্ঞান সত্য প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ভক্তি যদি সম্ভ্রমের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়া জীবনে পরিপাক করিতে যত্ন না করে, তবে সে প্রকাশের কোন মূল্যই থাকে না; আবার জ্ঞান আলোক দান করিয়া যদি সত্য বস্তু সুন্দর বস্তু প্রকাশ না করে ভক্তি তখন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান ভক্তির প্রাণ, ভক্তি জ্ঞানের শক্তি। জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি অসমর্থ, ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর। আবার জ্ঞানের সাহায্য পাইয়া ভক্তি যখন সত্যবস্তু সারবস্তু গ্রহণ করে, তখন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারা অসম্ভব। কেন না জ্ঞান কর্ত্তৃক প্রকাশিত সত্য যে ভক্তি গ্রহণ করিল তাহার প্রমাণই কর্ম্ম। কোন সত্য জীবনে গৃহীত হইয়া পরিপাক পাইলেই তাহার ফল আসিবেই। সেই ফলের অর্থই কর্ম্ম। সত্য গৃহীত হইয়া কোন শক্তি জীবনের উপর প্রকাশ করিল না কি করিবে না, ইহা অতি অসম্ভব কথা। আমরা যখন ঈশ্বরবস্তুকে গ্রহণ করিয়াছি তাহার পূর্ব্বে জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, কেন না জ্ঞা· আলোক দান করিয়া এই সদসম্মিশ্রিত জগতে ঈশ্বর ও অনীশ্বরের বিভিন্নতা না দেখাইলে আমরা অনীশ্বর ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর গ্রহণ করিতে পারিতাম না। আবার জ্ঞান যখন বিশদরূপে আত্মানাত্ম-বিষয়ক বিভিন্নতা প্রদর্শন করিল, তখন ভক্তি তাহার রূপে গুণে মোহিত হইল, ভুলিল, তাই তাহার লোভ জন্মিল, লোভ জন্মিল বলিয়া আর গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিল না। লোভী

হওয়ার লক্ষণ এই, যাহারা লোভী হয় তাহারা আর স্ববশে থাকিয়া বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। ভক্তি যে ঈশ্বরকে জীবনে গ্রহণ করিল তাহার প্রমাণ কি? কর্ম্ম। প্রতিদিন আত্মা তাঁহার উপাসনা ধ্যান ধারণা করিতে নিযুক্ত হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবনকে তাঁহার হস্তে তাঁহার কার্য্যে সমর্পণ করিয়া সুখী হইল। ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে জীবন ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছে। জীবন ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াও উপাসনা বা প্রিয় কার্য্য করিবে না—না করিয়া তাঁহার দত্ত অন্ন জল ভোজন পান করিবে ইহা কখনও সম্ভব নহে। কেন না তেমন বস্তু পাইয়াও কেহ ভুলিবে, ইহা অসম্ভব। অতএব জ্ঞান থাকিলেই ভক্তি থাকিবে, ভক্তি থাকিলেই কর্ম্ম থাকিবে, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি ও ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান গাঁথা; আবার জ্ঞান ভক্তি সহ কর্ম্ম গাঁথা রহিয়াছে। ইহার একটির সঙ্গে যোগ ভঙ্গ হইলে অন্যটির আর কোন শক্তি থাকে না। এইরূপে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম জীবনে সমন্বিত হইলেই প্রজাপতিত্ব লাভ করা যায়।

"বন্ধুগণ, আপনারা গুটিপোকার প্রজাপতিত্ব লাভের কথা বোধ হয় অবগত আছেন। এই পোকার প্রথমাবস্থাতে ইহাদিগের গাত্র হইতে এক প্রকার আঠার ন্যায় বস্তু বাহির হইয়া সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলে; পরিশেষে সেই সকল আঠা এক প্রকার জালময় কোষাকারে পরিণত হইতে থাকে। যখন আঠাগুলি কোষাকারে পরিবর্ত্তিত হয়, তৎকালে গুটিপোকাগুলি সেই কোষমধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ে আর বাহির হইতে পারে না। গুটিপোকা সেই কোষবদ্ধ অবস্থাতেই ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। ক্রমে পুষ্টিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি

পক্ষ বাহির হইয়া পড়ে। পক্ষ বাহির হইলে পর, যখন তাহারা আপনাদের উড়িবার শক্তি সমাগত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন সেই জালময় কোষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং পক্ষসঞ্চালনপূর্ব্বক অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। মনুষ্য এইরূপ। মনুষ্য প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে জরায়ুমধ্যে ডিম্বাবস্থায় অবস্থিতি করে। তার পর পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিবারমধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়। এই সময়ে তাহার অবস্থা ঠিক গুটিপোকার অবস্থার অনুরূপ, কেন না এই সময়ে সে দেহসম্ভূত মহাজালে আবৃত হইয়া পড়ে এবং সেই বদ্ধভাবে থাকিয়াই ক্রমে ক্রমে পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। যখন সে উপযুক্তরূপে পুষ্টিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তখন ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার হইতে থাকে। জ্ঞানের সঞ্চার হইলে আলোক আসিল, অন্ধকার চলিয়া গেল, তখন সে সত্য মিথ্যা, ইষ্টানিষ্ট, আত্মনাত্ম বুঝিতে পারিল, যখন অসত্যের ভিতর হইতে সত্য বাহির হইল, অনাত্মা হইতে আত্মা স্বতন্ত্র হইল, অনিষ্ট হইতে ইষ্ট বস্তু পৃথক্ হইয়া পড়িল। সেই সময়ে ভক্তি উদিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিল, হৃদয় মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। কেন না হৃদয় বিমুগ্ধকর কোন বস্তু যদি চক্ষুতে পড়ে, পড়িয়া যদি প্রাণ মনকে বিমুগ্ধ করে এবং বিনা বাধায় তাহা পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা ছাড়ে কে? এই যে জ্ঞান আর ভক্তি ক্রমে মানবজীবনে উন্মেষিত হইল, ইহারা আত্মা পক্ষীর অনন্ত ব্রহ্মাকাশে উড়িবার পক্ষস্বরূপ হইল। এই দুইটি পক্ষসঞ্চালনে যে বায়ুরাশি ঘনীভূত হইয়া পক্ষের আশ্রয় হইল তাহার নাম কর্ম্ম। জ্ঞান ভক্তির পরিচালনে কর্ম্ম উদ্ভূত হইল, সেই কর্ম্মাবলম্বনে মানব চলিতে লাগিল। যখন কর্ম্ম আসিয়া

জ্ঞানভক্তির সহিত সম্মিলিত হয়, তখন মানব আপনার গতিশক্তি, উড়িবার শক্তি সমাগত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারে। কাজেই আর মায়াকোষে বদ্ধ হইয়া বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তখন সে মায়াকোষ, আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত-ব্রহ্ম-শক্তি-সত্তার দিকে ধাবিত হইল। এইরূপে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়ে মনুষ্য প্রজাপতিত্ব লাভ করে। আমরা এই সংসারে মায়াকোষে বদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইতে আসি নাই। কিন্তু এই বদ্ধভাবের মধ্যে থাকিয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করিব বলিয়া আসিয়াছি। গুটি পোকা যেমন কোষবদ্ধ অবস্থায় জীবিত থাকিলে নিশ্চয় প্রজাপতিত্ব লাভ করিবেই একটিও কীট আর কীটের অবস্থায় থাকিবে না, সেই প্রকার মানব এই সংসারকোষে বদ্ধ থাকিয়াই প্রজাপতিত্ব লাভ করিবে, একটিও মানব বঞ্চিত থাকিবে না। যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সন্ধান করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় সপ্রমাণ হইবে যে, কোষ প্রস্তুত হয় পক্ষ প্রস্তুত করিবার জন্য। কোষ না হইলে নিরাপদে পক্ষ প্রস্তুত হইতে পারে না, এ কথা যদি সত্য হয় তবে বদ্ধাবস্থাই যে মুক্তির মূল তাহা অতি সহজেই বোঝা যাইতে পারে। অতএব বদ্ধাবস্থাতে ভয় নাই, যাহা ভগবানের নিয়ম ব্যবস্থা তাহা আমাদের কল্যাণেরই জন্য, এই মূলতত্ত্বে স্থির থাকিয়া সকলে প্রজাপতিত্ব লাভে যত্ন করুন।”

ফুলবাড়ী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রেরিত কালীশঙ্কর ধর্ম্মতত্ত্বে “সাধ্যসাধনপ্রণালী” নামে দুইটি প্রবন্ধ লিখেন। এ দুইটি উপক্রমণিকামাত্র, তাঁহার এ সম্বন্ধে আরও লিখিবার অভিলাষ ছিল। তিনি কলেবরত্যাগের প্রাক্কালে বিষয়টির পূর্ণতাসাধনের জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আমরা এ পর্য্যন্ত

তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। এখন দেখিতেছি তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যেই সমগ্র বিষয়টির বীজ নিহিত আছে। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর সেই বীজ বন্ধ্যাভাবে পড়িয়া রহে নাই। আমাদের অজ্ঞাতসারে অনেক সুফল প্রসব করিয়াছে, এবং তাঁহার অনুরোধ অনেকটা তদ্দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেই তিনি যোগের কোন্ ভূমিতে তৎকালে উত্থান করিয়াছিলেন তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এই দুটি প্রবন্ধ এখানে আমরা সন্নিবিষ্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"সাধনবলে যে সকল বিষয়কে আয়ত্ত করা যায় তাহা সাধ্য নামে পরিচিত। সাধ্য বিষয়সকলকে যে উপায় অবলম্বন করিয়া স্ববশে আনয়ন করা যায় তাহার নাম সাধন। আর যে অবস্থাতে সাধ্যবিষয় সকল জীবনে স্থায়ী হইয়া যায়, তাহাদিগকে স্ববশে রাখিবার জন্য আর যত্নের প্রয়োজন হয় না, তাহাকে সিদ্ধি বলা যায়।

"যে অংশ বা লক্ষণ জীবনের নিজস্ব সম্পদ্, জীবনে থাকা উচিত, কিন্তু কোন বিকার বা অস্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা তাহা জীবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; সুতরাং কোন উপায়যোগে সেই গুলি জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা চাই নতুবা চলে না। এই সকল জীবনাংশ যাহা জীবন হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনে পুনর্ব্বার আনয়ন করিতে হইবে, তাহারই নাম সাধ্য বলা হইয়াছে। এই সকল জীবনাংশ উন্নতিশীলতার বীজ।

"জীবনের কতকগুলি লক্ষণ বা অংশ যাহা থাকিলে প্রকৃত জীবনের ভাব ব্যক্ত হয়, না থাকিলে জীবনের অভাব প্রকাশ

পায়, সেই বিষয়গুলি জীবনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলেই কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। জীবনেরই অংশ বা লক্ষণ জীবনে থাকা উচিত, কিন্তু রোগ বা দৌর্ব্বল্যবশতঃ সেই লক্ষণ সকল জীবন হইতে সরিয়া যায়, এবং মানুষকে রুগ্ন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে; সে অবস্থায় আর মানুষ পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে বলিতে ও কার্য্যসাধন করিতে পারে না। সংসারে থাকিলেই কার্য্যসাধন করা আবশ্যক, কার্য্যসাধন করিতে হইলেই বল ও সুস্থতার প্রয়োজন। সুতরাং যে উপায় করিলে জীবন সুস্থ ও সবল হইয়া কার্য্য করিতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই ঔষধ সেই পথ্য সেবন করিতে হয়। এই সকল উপায় এই সকল ঔষধ ও পথ্যের নাম সাধন।

"যখন রোগ চলিয়া যায়, দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়, জীবন ব্যাধি-শূন্য সবল ও কার্য্যপটু হয়, কার্য্যসাধনে স্ফূর্ত্তি উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রকাশ পায়, আলস্য প্রমাদ নিরুৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিহীনতা থাকে না, জীবনের সকল বিভাগেই আনন্দহিল্লোল বহিতে থাকে, সেই অবস্থার নাম সিদ্ধি।

"সাধ্যবস্তু অনেক, কিন্তু তাহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; গৌণ আর মুখ্য। অভাবগুলি সাধ্য মূল। যাহা জীবনে থাকিলে তাহারই অপর মুখ্য বিষয়গুলিও আপনাপনি জীবনে উদিত হয় তাহাই মুখ্য বা প্রধান, অবশিষ্ট সমুদায় গৌণ। প্রথম সাধ্য স্বভাব। এই স্বভাবকেই আমরা পূর্ব্বে ধর্ম্ম বলিয়াছি। এই স্বভাবই হিন্দুশাস্ত্রে মুক্তি * নামে পরিচিত। এই স্বভাবে উত্থান করা বা রোগমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য লাভ করা একই কথা।

* মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

"মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য এই স্বভাবে উত্থান করা এবং উত্থান করিয়া তাহাতে চিরকাল স্থিরভাবে অবস্থিতি করা। জগতে যত মনুষ্য আছে, প্রায় সকলেরই জীবন বিকারগ্রস্ত বা স্বভাব-চ্যুত। এই বিকার বা বিকৃতির পরিমাণ কোথাও অধিক, কোথাও বা অল্প এইমাত্র প্রভেদ। সুতরাং ধর্ম্মসাধন করা বা স্বভাবে উত্থান করিবার জন্য যত্ন করা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বভাব কি, স্বাস্থ্য কি, জীবনের লক্ষ্য কি, অগ্রে জানা চাই, কেন না লক্ষ্য স্থির না করিয়া তৎসাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, অতএব প্রথমতঃ মানবজীবনের লক্ষ্য কিংবা তাহার স্বভাব নির্দ্দেশ করিয়া দেখান যাইতেছে।

"মানুষের স্বভাব সচেতনভাবে বা জাগ্রৎ ভাবে ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করা অথবা মানুষ ঈশ্বরকর্ত্তৃক জীবিত, ঈশ্বরাশ্রয়ে অবস্থিত, ঈশ্বরভ্রষ্ট মনুষ্যজীবন অসম্ভব, এইটি উজ্জ্বলভাবে জানাই মনুষ্যের স্বভাব বা লক্ষ্য। মৎস্য যেমন জলে বাস করে, জলই মৎস্যের জীবন, জল ভিন্ন মৎস্যের জীবন অসম্ভব ইহা যেমন মৎস্য জানে, যখন জল শুকাইতে থাকে তখন যেমন মৎস্য জীবনের বিপদ্ জানে বলিয়া যে দিকে গভীর জল সেই দিকে বেগে ধাবিত হইতে থাকে, সেইরূপ মনুষ্য ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মসত্তার দ্বারা ওত প্রোত হইয়া জীবিত আছে, তাহার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে অধঃ ও উর্দ্ধে ব্রহ্মসত্তা ও শক্তি, তাহার অস্থি মজ্জা রক্ত মাংসে ব্রহ্ম সত্তা ও শক্তি থাকিয়া তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই জানা ও জানিয়া সচেতনভাবে সেই সত্তাতে অবস্থিতি করা তাহার স্বভাব বা লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সাধন করিতে পারিলেই সিদ্ধি। এই সাধনের সিদ্ধিলাভের নামই মুক্তি। এই মুক্তিকে আবার

হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন *। সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সার্ষ্টি মুক্তি সৃষ্টিবিষয়িণী। সৃষ্টি সত্ত্বরজস্তমোময়ী, সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা। এই ত্রিগুণ হইতে শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বনিষ্ঠ বেদনা আর মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে না তাহার নাম সার্ষ্টি। তাহার পর সালোক্য, ইহা লোক সহ বা লোকবিষয়ক। এই লোকবিষয়িণী মুক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। মনুষ্য হইতে যে সকল তিক্ত বা মিষ্টভাব আসিয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে, তাহার সেই সকল ভাব হইতে আসক্তি বা বিরক্তি প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া মানুষকে বিপন্ন করে। যে অবস্থায় উত্থিত হইতে পারিলে সেই সকল আক্রমণজনিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় সেইটি প্রথম। দ্বিতীয় ঈশ্বর লোকবাসী যে সকল আত্মা, তাঁহাদিগের অনুরূপ হওয়া, অথবা ঈশ্বরলোকে সতত অবস্থিতি করা। তাহার পর সারূপ্য, ইহা রূপবিষয়িণী। এই রূপ প্রেম পুণ্যাদির আতিশয্য। ঈশ্বরের প্রেমপুণ্যাদি (পরিমাণে নহে কিন্তু ভাবে) দ্বারা ব্যাপ্ত বা ওতপ্রোত হইয়া পাপ দুঃখাদির আক্রমণ হইতে স্বতন্ত্র থাকা। তাহার পর সাযুজ্য। ইহা যোগবিষয়িণী মুক্তি, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিয়ত ঈশ্বর সহ যুক্ত থাকা বা ঈশ্বর সহ নিয়ত যুক্তভাবে অবস্থিতি করিতেছি এইটি স্পষ্ট অনুভব করা। প্রকৃত কথা এই,—সাধক সাধন করিতে করিতে যখন বিষয়াকর্ষণ হইতে স্বতন্ত্র হন সেইটি সার্ষ্টি মুক্তির অবস্থা। পরে আরও উচ্চতা লাভ হইলে এ লোকের সংবাদ পরিত্যাগ করিয়া

* সার্ষ্টিসালোক্যসারূপ্যসাযুজ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

সেই লোকের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাহার পর ঈশ্বরের প্রেমপুণ্যাদি আপনাতে সমাবিষ্ট করিয়া তিনি বিগতজ্বর হন। এই ত্রিবিধ অবস্থা অতিক্রম করিয়া পর পর ঈশ্বর সহ যোগ উপলব্ধি হইতে থাকে, অর্থাৎ আমি ঈশ্বরজীবনে জীবিত আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই এইটি অতি স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এই প্রত্যক্ষ ভাব লইয়া সচেতনভাবে স্থিতি করাই মানুষের স্বভাব বা লক্ষ্য। পূর্ব্বে যে যে স্বভাবের কথা বলা হইল সেই স্বভাব আর মুক্তি একই কথা; মুক্তিতে উন্নতির ক্রম ধরিয়া চারিটি অবস্থা ভিন্নরূপে দেখান হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। অন্যথা ভাব বা বিকার পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবে বা প্রকৃতিতে অবস্থান করা মুক্তির সাধারণ লক্ষণ। সাষ্টি সারূপ্য প্রভৃতি সেই স্বভাবেরই উন্নতিগত তারতম্যমাত্র।

"স্বভাবকে আমরা প্রধান সাধ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি কেন? স্বভাব মুখ্য সাধ্য বলিয়া কেন গণ্য হইল? স্বভাব সাধ্য বস্তুর মূল। যদি স্বভাবে থাকিতে পারা যায়, অন্যান্য সাধ্যবস্তু আয়ত্ত করিবার জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। স্বভাবের গুণে তাহা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বভাবে থাকার অর্থ সচেতন ভাবে ঈশ্বরসহবাস অনুভব করা। ঈশ্বর সহবাসে আছি, ইহা জানিয়া কেহ তাঁহাকে ভক্তি প্রীতি না দিয়া থাকিতে পারে না। এস্থলে স্বভাব মুখ্য সাধ্য, ভক্তি প্রীতি গৌণ সাধ্য, কেন না স্বভাবে থাকিতে পারিলে ভক্তি প্রীতি না হওয়া অসম্ভব। আর একটি কথা এই; স্বভাব পাপ বহির্ভূত অবস্থা। স্বভাবে আছি অথচ পাপ করিতেছি এ কথার কোন অর্থ হয় না। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে।

অগ্নির ভিতরে বাস করা আর স্বভাবে বাস করা একই কথা। অগ্নি আশ্রয়ভূমি, অগ্নি জীবন, অগ্নিই জীবিকা, চারি ধারে অগ্নির বেড়া, ভিতরে অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস সমুদায়ের ভিতরে অগ্নি জ্বলিতেছে, এ অবস্থায় বাহিরের কীট পতঙ্গাদির দৌরাত্ম্য একেবারে অসম্ভব। কেন না অগ্নিতে পতঙ্গ প্রবিষ্ট হয় কেবল মৃত্যুরই জন্য, সুতরাং পাপপতঙ্গ আর অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া কোন উৎপাত করিতে পারে না। ব্রহ্মশক্তি ও সত্তাদ্বারা আমি ওতপ্রোত হইয়া আছি, ইহা যদি সর্ব্বদা আমার প্রত্যক্ষ হয়, তবে আর অন্য কথা মনে থাকিতে পারে না, কোন স্থান দিয়া এক বিন্দুও ফাঁক নাই, সকলগুলি ফাঁক ব্রহ্মশক্তি ও সত্তা আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; পাপচিন্তা পাপানুষ্ঠানের সমুদায় পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য বলা হইয়াছে যে স্বভাব পাপবহির্ভূত অবস্থা, কেবল স্বভাবে থাকিতে পারিলেই যদি এত দূর হয় তবে স্বভাব যে মুখ্য সাধ্য, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।"

এই প্রবন্ধে মুক্তি ও স্বভাবসম্বন্ধে যে সকল কথা প্রেরিত কালীশঙ্কর বলিয়াছেন তাহাতে প্রাচীন শব্দগুলিকে প্রাচীন ভাবে নহে নবীন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তবে এ ব্যাখ্যার গৌরব এই যে, এই দুই শব্দ যে ভাববহন করিতে অসমর্থ, সে ভাবে উহাদিগকে পূর্ণ করা হয় নাই। দ্বিতীয় প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও যে অনেক নূতন ভাবের সমাবেশ হইয়াছে পাঠকমাত্রেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

"আমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মসত্তা ও শক্তির কথা বলিয়াছি। যাঁহার ভিতরে সমুদায় বিশ্ব সংসার নিমগ্ন হইয়া আছে, মনুষ্য প্রভৃতি জীব জলস্থিত মৎস্যের ন্যায় যাঁহার ভিতরে থাকিয়া জীবনলাভ

করিতেছে,এই সত্তা ও শক্তি কর্ত্তৃক ওতপ্রোত ভাবে সমাচ্ছন্ন দর্শন করাই মানুষের ধর্ম্ম বা স্বভাব ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্তা ও শক্তিরূপে দর্শন করিলে প্রকৃত পরিত্রাণ বা প্রকৃত জীবন লাভ হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ইহা প্রকৃত ঈশ্বরভাব নহে। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্বন্ধ নিত্য অচ্ছেদ্য। যে স্থলে কর্ত্তৃত্ব আছে, বিধাতৃত্ব আছে, সে স্থলে কেবলমাত্র শক্তি বলিলে তাঁহার প্রকৃত ভাব পরিস্ফুট হয় না। শূন্যসমকক্ষ সত্তা, ইহা বৌদ্ধদিগের আশ্রয়ভূমি, বৌদ্ধগণ সমুদয় বিরোধী ভাব উড়াইয়া ছিলেন, রাখিলেন কেবল এক জ্ঞানময় সত্তা। এই সত্তার বিষয়ে কিছু বলা যায় না, কেবল অবাক্ হইয়া ভোগ করা যায় মাত্র। ইহা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ভাব, কিন্তু স্রষ্টা পাতা মঙ্গলদাতা প্রভুর ভাব নহে। তার পর শক্তি। শক্তি বলিলেও বায়বীয় শক্তি, আগ্নেয় শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, বিষশক্তি প্রভৃতি জড়ীয় ভাব মনে হয়, কিন্তু পরিত্রাণপ্রদ জীবনপ্রদ সর্ব্বস্বপ্রদ ঈশ্বরের ভাব মনে হয় না। অতএব ঈশ্বরকে সত্তা ও শক্তিময় ব্যক্তিরূপে দর্শন করিতে হইবে। এই বিশ্বসংসার যে সত্তা ও শক্তি কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া আছে, যদ্দ্বারা জীবন ও জীবিকা লাভ করিতেছে, তিনি কি ব্যক্তি? ব্যক্তি বলিলে আমরা কি বুঝি? ব্যক্তি বলিলে এক ক্ষমতাপূর্ণ ক্রিয়াশীল প্রকাশ বুঝায় অর্থাৎ যিনি করিতে করাইতে, চলিতে চলাইতে, বলিতে, বলাইতে, বুঝিতে বুঝাইতে পারেন এবং ইঙ্গিতমাত্র সমুদয় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, রক্ষা ও পালন করিতেছেন তাঁহাকে বুঝায়! সমুদায় বিশ্ব সংসার সহ আমরা এই মহান্ ব্যক্তিত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, এই বিপুল ব্যক্তিত্বমধ্যে সিন্ধুমধ্যে

জলবুদ্বুদের ন্যায় আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমরা ব্যক্তি, আমরাও ক্রিয়াশীল কর্ত্তা বটে, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য প্রভৃতি আছে, কিন্তু তাহার কিছুই আমাদিগের নিজস্ব নহে। ঐ মহতী বিশ্বব্যাপিনী শক্তিময় ব্যক্তি হইতে প্রতিনিয়ত আমাদিগের জীবনে ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে কর্ত্তৃরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে তাই আমরা ব্যক্তি। আমরা নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদিগকে ঈশ্বরের বিপুল ব্যক্তিত্বমধ্যে নিমগ্ন দেখিতে পাই। এই বিশ্বের যিনি কর্ত্তা, তিনি আমারও কর্ত্তা। কর্ত্তৃরূপে তিনি আমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। অন্তরে বাহিরে জীবনব্যাপী এক কর্ত্তা আমার রক্ষক পালকরূপে আছেন, ইহা যদি আমি প্রতিনিয়ত উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই, তবে ভয়ভাবনা কিসের ?

"আর একটী কথা বিশেষ মনোযোগ দিয়া বুঝিতে হইবে। মানুষও ব্যক্তি, ঈশ্বরও ব্যক্তি। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব মানুষের ব্যক্তিত্বের অনুরূপ নহে। মানুষের বাহিরে হস্ত পদ চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও শারীরিক বল আছে, অন্তরে বিবেক বুদ্ধি প্রভৃতি আন্তরিক বল আছে, সেই জন্য মানুষ ব্যক্তি। ঈশ্বরের হস্ত পদ চক্ষুঃ কর্ণাদি শরীর বা শারীরিক উপাদান নাই, কিন্তু এই সকল শক্তি আছে। এই জন্য ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি, মানুষ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি। তাঁহার পদ সর্ব্বত্র, হস্ত সর্ব্বত্র, তাঁহার অক্ষিশিরোমুখ সর্ব্বত্র, তিনি সকল স্থানে শ্রুতিবিশিষ্ট সকল আবৃত করিয়া স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাতে সকল ইন্দ্রিয়শক্তি আছে কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় নাই *। এই কারণে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সর্ব্বত্র

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতো হক্ষিশিরোমুখম্।

পূর্ণ, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র সূচিকার অগ্রভাগেও পূর্ণ ব্যক্তি, আবার মহাসমুদ্রবক্ষেও তিনি পূর্ণ ব্যক্তি। একটি ফুলের গাছে থাকিয়া তাহাতে রস যোগাইতেছেন, শাখাপত্রাদি রচনা করিতেছেন, ফুল ফুটাইতেছেন, ফুলে নানা বর্ণ (যেখানে যাহা প্রয়োজন) দিয়া বিচিত্র করিতেছেন, আবার শস্য ক্ষেত্রে থাকিয়াও তাহার সমুদায় প্রয়োজন সম্পন্ন করিতেছেন। এইরূপে এই বিশাল বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র তাঁহার অধিষ্ঠান, সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা। তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণ ক্ষমতার সহিত উপস্থিত থাকিয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। মানুষ সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে বা ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না, যে স্থানে থাকে সেই স্থানেই তাহার ক্ষমতার শেষ অন্যত্র নাই। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের বিশেষ গৌরব এই যে, তিনি শূন্য হইতে বস্তু বাহির করিতে পারেন, এবং অতি শৃঙ্খলাসহকারে সমুদায় শাসন রক্ষণ করিতে সমর্থ। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিয়া দেখেন শোনেন, বোঝেন বুঝান। আমরা প্রতিনিয়ত এই সর্ব্বব্যাপী বিধাতৃপুরুষের কর্তৃত্বমধ্যে নিহিত হইয়া আছি, তিনি আমাদিগকে দেখিতেছেন, জানিতেছেন, বলিতেছেন, বুঝাইতেছেন, এইটি জানা ও দেখা আমাদের স্বভাব, এই স্বভাবে স্থিতি করাই ধর্ম্ম।

"এই স্থানে আর একটী কথা উপস্থিত করা অতি আবশ্যক। ঈশ্বরকে যদি ব্যক্তি বলা যায়, তবে দার্শনিক নিয়মানুসারে তাঁহাতে অপূর্ণতা আরোপ করা হয়। ঈশ্বর ব্যক্তি এইজন্য যে তিনি পাপীর প্রতি দণ্ডবিধান, পুণ্যবানের প্রতি পুরস্কার দান

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং॥

করেন। তিনি বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহার শাসন ও শৃঙ্খলা বিধান করিতেছেন। এই সকল করিতে হইলে দণ্ডের সময়ে উগ্রতা, পুরস্কারের সময়ে সন্তোষ ও মৃদুতা, সৃষ্টি করিবার সময় উদ্যম ও অধ্যবসায়, না করিবার সময়ে বিশ্রাম ও সাম্যভাব ইত্যাদি পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকিতে পারে না। এই সকল পরিবর্ত্তন অপূর্ণতার প্রমাতা, সুতরাং ঈশ্বরের পূর্ণ-ভাবের বিরোধী। আবার ঈশ্বরকে যদি ব্যক্তি না বলি, তাহা হইলে তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তাও বলা যায় না, কেন না কর্ত্তা ও ব্যক্তির অর্থ একই। অন্য দিকে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সৃষ্টির জন্য, ব্যক্তি না বলিলে স্রষ্টা না বলিলে ঈশ্বর মানিয়া প্রয়োজন কি? সত্য বটে এই দোষ পরিহার করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ এক মায়াশক্তির কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সৃষ্টির কার্য্যের ভার দিয়া ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। ইহা দ্বারা সে দোষ নিরাকৃত হয় নাই, হইতে পারেও না। কেন না ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির করিলেন না মায়া সৃষ্টি করিলেন, সেই মায়া সৃষ্টির সময়েও তাঁহাতে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। অতএব ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ। তিনি স্বয়ং পূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিত্বও পূর্ণ। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, পাপীকে দণ্ড দেন, পুণ্যের পুরস্কার দেন, সকলই করেন, কিন্তু তাহার দ্বারা কখন বিকৃত হন না। ইহা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের অনুরূপ। মানুষ অসমর্থ দুর্ব্বল, এইজন্য অনীশ্বর, ঈশ্বর সমর্থ বা প্রভু এই জন্যই ঈশ্বর; সুতরাং মনুষ্য যে কারণে বিকৃত ও ভাবান্তরিত হয়, ঈশ্বর সে কারণে বিকৃত ও ভাবান্তরিত হন না। পৃথিবীর মানুষের মত যদি ঘটনাস্রোতে পড়িয়া ঈশ্বর বিকৃত হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব আর

থাকে কৈ? মানুষের কর্তৃত্ব বাহ্য জগৎ বা বিষয়ের উপরে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সমস্ত বিশ্বসংসারের উপরে। মানুষ জানিয়া শুনিয়া বিষয়াকর্ষণ সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া পদদলিত করিয়া ঈশ্বরের হস্তে জীবন উৎসর্গ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারে, এইটি মনুষ্য-জীবনের গৌরব।

"সাধনের দুইটি অংশ, একটি জ্ঞানতঃ অন্যটি কার্য্যতঃ। মানুষের স্বভাব যেরূপে বর্ণিত হইল এইটি জ্ঞানযোগে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যত দূর সম্ভব ইহা বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে এই প্রথম উপায়। দ্বিতীয়তঃ শয়নে উপবেশনে গমনে ভোজনে চিন্তাতে কার্য্যে এক কথায় জীবনের সমুদায় অবস্থাতে এইটি স্মরণে রাখিতে হইবে। আমি যে ব্রহ্ম সত্তা শক্তি, এবং তাঁহার কর্তৃত্ব মধ্যে স্থিতি করিতেছি, তাঁহার বল আমার বল, তাঁহার দেওয়া বুদ্ধি বিবেচনা আমার ভিতরে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ সত্তামাত্রকে স্মরণ করিতে হইবে, তার পর সত্তাকে স্মরণ করিতে করিতে শক্তির ভাব মনে হইবে। সেই শক্তিকে স্মরণ করিতে করিতে শক্তিমান্ হওয়া চাই। সেই শক্তি আরও উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইলে ব্যক্তিত্বের ভাব ঘন হইয়া আসিবে। এই ব্যক্তিত্বের ভাব স্মরণ মনন করিতে করিতে উহা ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আসিবে। পরে এই তাঁহাকে দেখিতেছি, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আনন্দের লহরী উঠিবে, জীবনের চারিদিক্ আনন্দধারায় প্লাবিত হইয়া যাইবে। তাঁহাকে দেখিয়া সুখ, তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ, তাঁহার কাছে বসিয়া সুখ, সুখের উপর সুখ,

মহাসুখের প্লাবন বা প্রবাহ বহিতে থাকিবে; তখন আর অবসর থাকিবে না। অদ্য উপাসনা ভাল হইল তাই বড় সুখী হইলাম, এ কথা বলা যাইবে না। ভাল উপাসনা হইল, ইহার অর্থ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল না, পাইলাম তাই কৃতার্থতা; কিন্তু স্বভাবসাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে সর্ব্বদাই দর্শন লাগা থাকে, সুতরাং আনন্দস্রোতের আর বিরাম থাকে না।"

১৬ অগ্রহায়ণ (১৮১১ শক) ধর্ম্মতত্ত্বে এই প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, ২৪শে মাঘ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই অবসর মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে এই প্রবন্ধের পূর্ণতাসাধনজন্য তিনি আর লেখনী ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে যোগের আস্বাদ আপনি পাইয়াছিলেন এবং যে যোগ তাঁহাকে রোগশয্যায় প্রফুল্লহৃদয় রাখিয়াছিল, সেই যোগই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এ দুই প্রবন্ধ আর কেবল মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া কোন কালে অনাদৃত হইবে না। প্রত্যুত অনেকের জীবনে ইহার প্রভাব প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখাপনয়ন এবং সুখবর্দ্ধন করিবে। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, প্রেরিত কালীশঙ্কর অন্যায় অনীতি অধর্ম্মের প্রশ্রয় কিছুতেই দিতে পারিতেন না। তদ্বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী ধারণ তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। এই ভাবের প্ররোচনাতেই তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে তান্ত্রিকমতপ্রবর্ত্তনের বিরোধে লিখিয়াছিলেন; "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের" সমালোচনার সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং এই সমালোচনা পত্রস্থ করিতে দিয়া তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ মনোবেদনা ছিল। সেই মনোবেদনার অপনয়ননিমিত্ত এবং তিনি সমালোচনার

নীতিরক্ষণে কি প্রকার সাবহিত ছিলেন তৎপ্রদর্শনজন্য আমরা সেই অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি তাঁহার জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলাম। এ সময়ে দুইটি যুবা তৎপ্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত; ইংরেজী ভাষায় উদ্ধৃত অংশগুলি তিনি তাহাদিগের দ্বারায় সংগৃহীত করিয়া প্রবন্ধে নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

"বিগত মাসের (২০ কার্ত্তিক, ১২৯৬ সন) 'নব্য ভারতে' কোন ব্রহ্মবাদী স্বাক্ষরকারী নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' নামক পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া বড়ই উষ্ণ মস্তিষ্কের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; আমি তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

"সমালোচক মহাশয় প্রথমতঃ লিখিয়াছেন যে 'দুগ্ধ পোষ্য শিশু শকটের তলে শুইয়াছিল, যশোদা স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন শকট ভঙ্গ হইয়াছে। অন্যান্য বালকেরা বলিল এই শিশু শকট ভাঙ্গিয়াছে। তাহাদের কথায় কেহ বিশ্বাস করিল না, আমরাও বিশ্বাস করিব না। তবে ইহা লিখিবার প্রয়োজন কি ছিল?' লিখিবার প্রয়োজন কি ছিল সমালোচক দৃষ্টিহীনতাবশতঃ বোধ হয় দেখিতে পান নাই। জীবনপ্রণেতা লিখিয়াছেন 'কৃষ্ণের বাল্য জীবনে কতকগুলি বিপৎ সমুপস্থিত হয়, সেইগুলিকে পৌরাণিকগণ কংসপ্রেরিত অসুরগণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।' শকটের নিম্নে শায়িত শিশুর উপরিস্থিত শকট যদি কোন কারণে ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হয় তাহা যে শিশুর প্রাণনাশক বিপদ তাহাও কি বুঝাইয়া দিতে হয়? এই ঘোর বিপদ সংঘটিত হইল অথচ তাহাতে কৃষ্ণজীবনের ক্ষতি হইল

না, ইহা দেখাইয়া কি উপাধ্যায় মহাশয় বড়ই অসৎ কার্য্য করিয়াছেন?

"'পূত না বধ, কালিয় দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি বাল্য কালের ঘটনা সমস্তই কল্পিত, তাহার ভিতর কিছুই সত্য নাই, এসকলের যদি কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে গ্রন্থকার তাহাও বলিয়া দেন নাই। ফলতঃ এই গ্রন্থের রচনা মধ্যে লেখকের মত কোন্‌টি আর পৌরাণিক ভ্রান্তি কুসংস্কারই বা কোন্‌টি তাহা নির্ব্বাচন করা কঠিন। গোলেমালে দুই একাকার হইয়াগিয়াছে। গ্রন্থ পড়িলে সহসা মনে হয়, নববিধানের উপাধ্যায় মহাশয় এরূপ অসঙ্গত অলৌকিক ঘটনায় কি বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস না করেন তবে এ বিষয়ে এত বাহুল্য বর্ণনা কেন? এবং তাহার সত্যাসত্য ব্যাখাই বা করেন নাই কেন?' এই সকল মিথ্যা কথা দ্বারা সমালোচক উপাধ্যায় মহাশয়কে অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন। এই সকল কথা যে মিথ্যা তাহা কৃষ্ণের জীবন হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাও পাঠক মহাশয় এস্থলে আর একবার পাঠ করুন। তার পর—'হরিবংশেও পূতনাকে একটী পাখী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্দ্ধ রাত্রের সময় দুই পাখার ঝাপটা মারিতে মারিতে এবং ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে শকুনীরূপা কংসধাত্রী পূতনা উপস্থিত। * * বিষ্ণুপুরাণ বালঘাতিনী পূতনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। * * শ্রীমদ্ভাগবত পূতনাকে একটী মূর্ত্তিমতী স্ত্রীরূপ বর্ণন করিয়াছেন। * প্রথমতঃ পূতনাকে বালগ্রহরূপে বর্ণন করিয়া পরে তাহার মায়াজনিত সৌন্দর্য্যবর্ণন কথিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। * * এই

নিয়মানুসারে আমরা দেখিতে পাই পূতনা অন্যান্য স্থানেও পেচক ও বক জাতীয় পক্ষী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। একটী পাখী মারিয়াছে বলিয়া যে শিশুপালের অবজ্ঞা তৎসহ হরিবংশ ও ভাগ-বত উভয়েরই মিল আছে। সে সময় ইগল প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় শিশুহননকারী পক্ষী যে ব্রজের বন্যভূমিতে অনেক ছিল, তাহা বসুদেব নন্দকে যখন সাবধান করিয়া দেন তন্মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে।' * * 'এখন জিজ্ঞাস্য এই যদি পাখীই হইল তাহা হইলে সে পাখীর নাম পূতনা হইল কেন? এবং পূতনা নামক বালগ্রহের সঙ্গে এক করিয়াই বা কেন গ্রহণ করা হইল? আমরা বিষ্ণুপুরাণের লেখা দৃষ্টে জানিতে পাইতেছি সে সময় ব্রজে অনেক শিশু হঠাৎ মরিতেছিল। এদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিতর স্তন্য-পায়ী শিশুগণের ভিন্ন ভিন্ন রোগের লক্ষণ সমুদয় লেখা আছে বটে, কিন্তু কারণ অবধারণ করিতে না পারাতে ঐ সকল বালগ্রহাবিষ্টের ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বালগ্রহগণের মধ্যে স্কন্দ গ্রহ সকলের প্রধান। শকুনী, পূতনা, অন্ধপূতনা ইহারই দলবল। গ্রহগুলির মধ্যে কতকগুলি পুরুষ, কতকগুলি স্ত্রী। শকুনী, পূতনা প্রভৃতি স্ত্রীজাতির মধ্যে গণ্য। এ মত অদ্যকার নহে, কৃষ্ণের জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে ধন্বন্তরি হইতে সমাগত। ধন্বন্তরি কেন এ মত অতি আদিম বৈদিক সময় হইতে প্রচলিত।' এই বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয় পৌরাণিক বৃত্তান্ত ও সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যথার্থ তত্ত্ব, কুসংস্কার ও কবিত্ব প্রভৃতির বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন। সে সমুদয় উদ্ধৃত করিতে হইলে আমাদের প্রস্তাব বা অতিশয় বড় হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তাহাতে বিরত রহিলাম। এক্ত কথা

পড়িয়াও সমালোচক মহাশয় পৌরাণিক কুসংস্কার ও গ্রন্থকর্ত্তার মতের বিভিন্নতা বুঝিতে পারেন নাই, ইহা কি গ্রন্থকর্ত্তার দোষ?

দিবাপ্যুলূকো যদি নাবলোকতে তদাপরাধঃ কথমংশুমালিনঃ।

'ভাগবত বলেন 'কৃষ্ণ চক্রবাত কর্ত্তৃক উর্দ্ধে নীত হইয়া পরিশেষে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে আমরা ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। এই চক্রবাতকে তৃণাবর্ত্ত নামা অসুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।' তৎপরে 'জমলার্জ্জুন ভঙ্গ।' 'তৃণাবর্ত্ত' একটী চক্রবাত বা ঘূর্ণ বায়ু, এবং জমলার্জ্জুন ভঙ্গ—বৃক্ষের মূল যদি গভীর ভাবে মৃত্তিকাতে প্রোথিত না থাকে এবং শিরোভাগ বেশী ভার হয় তবে বৃক্ষের ভূমিশায়ী হওয়া—এই দুইটী ঘটনাই কৃষ্ণজীবনসম্বন্ধে বিশেষ বিপদ তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই জনাই উপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্রণীত গ্রন্থে এই বিষয়দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ উপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠার নিম্নস্থ নোটে দ্রষ্টব্য।

"'কালিয় দমন'—কালিয়দমনও যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের জীবনসংশয়রূপ একটী বিপৎ তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। এই কালিয়হ্রদে নিমজ্জন যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বালচাপল্যবশতঃ হইয়াছিল তাহাও ঠিক। ইহাই এস্থলে উপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শাইবার বিষয়, আর কিছুই নহে। কৃষ্ণের নিকট কালিয় নাগের সপরিবারে স্তুতিবাদ ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনাবলী যে গ্রন্থকর্ত্তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং ঐ সমস্ত যে কেবল কল্পিত বলিয়া বলিয়াছেন তাহা পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠার নিম্নস্থ নোট দেখিলেই সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হইবে।

"'গোবর্দ্ধন ধারণ'—এই ব্যাপারে গ্রন্থকর্ত্তা প্রথমেই লিখিয়াছেন যে :— '* * এতক্ষণ আমরা যত গুলি ঘটনা লিখিলাম সে গুলির মধ্যে কৃষ্ণের জীবনে ধর্ম্মসংস্থাপন যে একটি ভাবী গুরু ব্যাপার নিহিত আছে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। গোবর্দ্ধনধারণ যত কেন অদ্ভুত ঘটনা হউক না আমাদের নিকট এই লক্ষণ প্রকাশের জন্য উহা মূল্যবান্। যখন শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মের কথা বলা হইবে তখন এই ঘটনাটী তৎসহ কি প্রকারে সংযুক্ত লেখা হইবে।' * * 'গোবর্দ্ধন গিরি যাঁহারা এখন দেখিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে উহার কতকাংশ নীচে নামিয়া পড়িয়াছে ; বোধ হয় পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটী বৃহৎ গহ্বর ছিল।' এখন এই স্থানে বক্তব্য এই যে এই সমস্ত ঘটনা যতই কেন অলৌকিক বা অসম্ভব হউক না তদ্বিষয়ে আমাদের দৃক্‌পাত করিবার কোন আবশ্যক নাই, কেন না উপাধ্যায় মহাশয় ইহার একটীকেও অলৌকিক বলিয়া বলেন নাই, তবে কেবল এই সমস্ত ঘটনাবলী স্বকীয় গ্রন্থে সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়া উপাধ্যায় মহাশয় এক দিকে পৌরাণিক লোকদের ভ্রান্তি ও অন্ধবিশ্বাস দেখাইয়াছেন এবং অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবনের সহিত বাল্যকালের এই সমস্ত ঘটনাবলীর গূঢ় সম্বন্ধ সন্নিবেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কোন একটী অলৌকিক ব্যাপারকে অলৌকিক বা কাল্পনিক বলিয়া প্রত্যাখান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবনে উহাদের কাহার কি সম্বন্ধ ইহা দর্শানই বাস্তবিক তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ; বিশেষ কৃষ্ণের জীবনে অধিক বয়সে যে সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার ও শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় পুরাণাদিতে পাঠ করা যায় তাহাও যে স্পষ্টভাবে তাঁহার শৈশবচাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালেও

প্রতিভাত হইত, বাস্তবিকই—"Child is the father of man" কথাটী যে সম্পূর্ণ সত্য ইহাও দর্শান উপাধ্যায় মহাশয়ের একটী উদ্দেশ্য বটে।

"'রাসলীলা'—রাসলীলা বিশুদ্ধ ব্যাপার, ইহা সপ্রমাণ করার জন্য উপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্রণীত গ্রন্থে তৎকালে কৃষ্ণের যে ব্রহ্মচর্য্যের সময় ছিল, সে সময়ে তৎকর্ত্তৃক কোন প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম-ভঙ্গজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, এইটী সপ্রমাণ করার জন্য তিনি দেবযানী ও কচের ব্রহ্মচর্য্যবিষয়ক বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমালোচক সেই ব্যাপারকে কি প্রকার অবিশুদ্ধ ভাবে বিচার করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'শিষ্য কচকে শুক্র ঋষি দেবযানীর সেবায় নিযুক্ত করেন। কচ দেবযানীকে পরিতুষ্টা রাখিবার জন্য বন পুষ্পাদি তুলিয়া উপহার দিতেন, নৃত্যগীতাদি সকলই করিতেন। দেবযানী ভিতরে তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন এবং তিনিও তাহার সঙ্গে নৃত্যগীতাদি করিতেন কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অনুরোধে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কচের নিকট প্রণয়ের কথা তিনি ব্যক্ত করেন নাই।' ইত্যাদি। এই যে দেবযানী ও কচ ইহারা উপাধ্যায়মহাশয়ের স্বকল্পিত ব্যক্তি নহেন; দেবযানী অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং কচ দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র এবং শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। কচ গুরুগৃহে, শুক্রাচার্য্য গুরুর নিকট সঞ্জীবনীমন্ত্র লাভের আশায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সময়ের এ ঘটনা। বাস্তবিক কচের ধর্ম্মজীবনের মাধুর্য্য ও শারীরিক সৌন্দর্য্যাদি দ্বারা দেবযানী বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন মনে মনে এরূপও স্থির

করিয়াছিলেন।* কিন্তু কচ দেবযানীকে চিরকাল গুরুকন্যা বলিয়া সম্মান করিয়া আসিয়াছেন, কেবল আচার্য্যের আজ্ঞাপালনার্থ তাহার সেবা করিতেছেন। সুতরাং তৎপ্রতি কোন প্রকার ইন্দ্রিয়বিকারজনিত আসক্তি মনে আসিতে দেন নাই। ইহাদের উভয়ের পরস্পর মধ্যে প্রেমও সঞ্চারিত হয় নাই। কেবলমাত্র দেবযানীর ভিতরেই প্রেম হইয়াছিল এবং তিনি সমাবর্ত্তনের কাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষাও করিতেছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে এই প্রেমবিষয়ের কোন প্রসঙ্গও তিনি কচের সঙ্গে করেন নাই। কিন্তু সমাবর্ত্তনের সময় যখন কচ গৃহে যাইতে উদ্যত হইলেন তখন দেবযানী আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু কচ তাঁহাকে গুরুকন্যা ভগিনী বলিয়া গৌরবের সহিত প্রত্যাখ্যান করি- লেন, এবং কোন রকমেই দেবযানীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে পরিশেষে দেবযানী ক্রুদ্ধা হইয়া কচের প্রতি অভিসম্পাতও করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইল যে ইন্দ্রিয়বিকারজনিত কোন প্রকার দোষ তাঁহাদিগকে সংস্পর্শ করে নাই। তৎকালের আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, শাস্ত্রপাঠে যেরূপ জানা যায় তাহাতে কেবল দেবযানী এবং কচ নহেন, সমুদয় দ্বিজাতিসমাজ এই শাসনে অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবযানী ও কচের বৃত্তান্ত কৃষ্ণের সমকালীন নহে। ইহা কৃষ্ণজন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতাদি গ্রন্থের লেখা দৃষ্টে জানা যায়। এই সকল বিষয় পুরাণাদির লেখা ভিন্ন সপ্রমাণ করিবার অন্য কি উপায় আছে? সুতরাং এই সকল প্রাচীন বিষয়ে পুরাণাদির প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, যুক্তিদ্বারা ইহার কোন

মীমাংসা হইতে পারে না। অথচ কৃষ্ণজীবনের সমালোচক নিম্নলিখিত কুৎসিত ভাষায় তাহার সমালোচনা করিয়াছেন যথা :—'এরূপ যদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা হয় তবে ইহা রাসলীলার বিলক্ষণ উপযোগীই বোধ হইতেছে। দুইটী যুবক যুবতী নির্জ্জন পুরী মধ্যে পুষ্পাদি বিনিময় করে, এক সঙ্গে নাচে গায়, যুবকটী যুবতীর সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকে, উভয়ের মধ্যে প্রেমও জন্মিয়াছে অথচ ইহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যও বজায় ছিল। এটী কি ব্রহ্মচর্য্য না প্রেমলীলা ?' সমালোচক এ ঘটনাটীকে কি অলৌকিক ঘটনা বলিয়া উপহাস করেন ? না, মানসিক উষ্ণতা দ্বারা পরি-চালিত হইয়া উপহাস করেন ? ইহার কোন মর্ম্মই আমরা ভেদ করিতে পারিলাম না।

"রাসলীলাসম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণের সময় স্ত্রী পুরুষে একত্র নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করা প্রচলিত ছিল। এখন আর সেরূপ এদেশে দেখা যায় না। অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে মণ্ডলাকারে নৃত্য আজও বন্য জাতি মধ্যে আছে। রাস তাদৃশ নৃত্যগীত ভিন্ন আর কিছুই নহে।' বাস্তবিক পক্ষে রাসসম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয়ের মতও এই, ইহা তদ্রচিত গ্রন্থপাঠেই সম্যক্ উপলব্ধি হয়। এই রাসে যে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার ইন্দ্রিয়বিকার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, ইহা যে পবিত্র ভাব পরিপূর্ণ বাল্য কৌতুক-মাত্র তাহা উপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃত নানারূপ শাস্ত্রবচনই যথেষ্ট প্রমাণ এবং তিনি নিজ ভাষাতেও তাহা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন (গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। একাদশ বৎসরের শিশুকে ঘূর্ণিত মস্তিষ্কের চক্রে ফেলিয়া সমালোচক অনেক সময়েই শ্রীকৃষ্ণের

কার্য্যে জেঠাম দেখিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড় আশ্চর্য্য হই নাই। যদি এই সমালোচনা সমালোচকের স্বাভাবিক মস্তিষ্কের কার্য্য হইত তবে আমরা তাঁহাকে অবশ্যই নিন্দা করিতাম। এখন এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে 'ঝিকে মেরে বৌকে বুঝানটা ভাল হয় নাই।' অনর্থক শিশু, নির্দ্দোষী কৃষ্ণবেচারীর প্রতি ব্রহ্মবাদীর আরক্তিম চক্ষুঃপ্রদর্শন লজ্জাজনক। কৃষ্ণ-চরিত্রসম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন শব্দার্থ লইয়া বিড়ম্বিত হইবেন এটি বিচিত্র নহে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন তাঁহারা কৃষ্ণকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবেন নববিধানো-পাধ্যায় মহাশয় অবশ্যই সে মতের বিরোধী হইবেন। এই গ্রন্থপ্রণয়নসম্বন্ধে যত দূর হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক অংশ হইতে কেবল সত্যাংশ অনুসন্ধান এবং তাহা গ্রহণই উপাধ্যায় মহাশয়ের এই উদ্যমের মূল উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত পক্ষেও তিনি তাঁহার এই উদ্যমে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। রাসসম্বন্ধে যত শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং এতদতিরিক্ত যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া যায় তাহার কোনটিতেই কৃষ্ণের সাময়িক লোকগণ ঐ ব্যাপারটিকে নিন্দা করিতেন এরূপ প্রকাশ নাই। শিশুপাল কৃষ্ণের ভয়ানক শত্রু ছিলেন, তিনি কৃষ্ণের জীব-নের ক্ষুদ্র কাজটীকেও প্রতিবাদ না করিয়া ছাড়েন নাই; তবে যদি গোপীগণ সহ কৈশোর বয়সে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের মধ্যে বাস্তবিকই কোন দোষের আভাস ছিল, তবে এই প্রকাণ্ড বিষয়ে শিশুপালের ভ্রম হওয়া তো বড়ই আশ্চর্য্য। আমরা বলিব এটি শিশুপালের ভ্রম নয়, ইহাতে বাস্তবিক পক্ষেই কোনরূপ

অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না এবং ইহা পবিত্র বাল্য কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহাতে কৈশোর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য্যের কোনরূপ হানি হয় নাই, ইহা উপাধ্যায় মহাশয়ও নিজগ্রন্থে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ যাহা বলিয়াছেন তাহা উপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেন নাই, আমরাও গ্রহণ করিব না। তবে রাসসম্বন্ধে নিন্দাবাদ হইল কেন? এ সম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয় যথেষ্ট বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আমাদের বক্তব্য এই, এই নিন্দাবাদ কৃষ্ণের তিরোধানের পর হইয়াছে।

"বিভিন্ন মতাবলম্বী এই ব্যাপার বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিবেন বিচিত্র কি? কিন্তু এই মতামত প্রচারের সময় মতদাতৃগণ শ্রীকৃষ্ণের বয়সের কথা ভাবিয়াছিলেন কিনা তাহাই দ্রষ্টব্য। যেরূপ কচ ও দেবযানীর ব্রহ্মচর্য্যকে সমালোচক মহাশয় 'প্রেমলীলা' বলিয়াছেন, সেইরূপ কৃষ্ণের কৈশোর বয়সে নির্ম্মল বাল্যকৌতুককে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের ব্যতিক্রম বলা তাৎকালিক লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। ঊনবিংশশতাব্দীর সভ্যতালোকে এবং নানারূপ শিক্ষার প্রভাবেও যখন সমালোচক মহাশয় এই পুস্তকের সমালোচনাব্যাপারে একদেশদর্শী হইয়াছেন, তখন ঐ আদিমকালে লোকের কৃষ্ণের পবিত্রভাবের প্রতি বিভিন্ন মত হওয়া আশ্চর্য্য কি? উপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ সম্যক্‌রূপে পাঠ না করিয়া সমালোচক প্রলাপ বলিবেন এটি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে একাদশ বর্ষমাত্র অবস্থিতি করিয়াছেন, তৎপর কংসাসুরের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া মথুরায় চলিয়া যান। এই যে একাদশ বৎসর ইহা বাল্যকালের মধ্যে পরিগণিত। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া

উপাধ্যায় মহাশয় সুন্দররূপে ইহা দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষমাত্র ব্রজে ছিলেন, কি বেশী দিন ছিলেন, এ বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে ঐ সমস্ত পৌরাণিক প্রমাণ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। এ স্থলে যুক্তি ও অনুমানমাত্র আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? এইটী ভাবিয়াই তিনি ঐ সকল শাস্ত্রীয় বচন ও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তত্রচ এখানে ব্রহ্মবাদী বলপূর্ব্বক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—'তাঁহার মতে না হয় কৃষ্ণ একাদশ বৎসরই ব্রজে ছিলেন' ইত্যাদি। এটি তাঁহার মত কিরূপে হইল তাহা কি ব্রহ্মবাদী বুঝাইতে সমর্থ? এর পর অতি নিন্দনীয় ভাষায় বলিয়াছেন, 'কিন্তু যে বালক পঞ্চম বর্ষে প্রকাণ্ড কালফণীর মাথায় চড়িয়া নাচিতে পারে, আরো শৈশবে পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিতে পারে, সপ্তমে গোবর্দ্ধন ধরে, দ্বাদশে মহাসুর কংশকে মারে, মথুরার পথে নির্দ্দোষ ধোপাবেচারীকে বস্ত্রের জন্য চপেটাঘাতে ভূতলশায়ী করে, তাহার পক্ষে কৈশোরে যৌবনোচিত ব্যবহার অসম্ভব কেন হইবে? ক্ষীর সর নবনী ভোজী যশোদার একমাত্র আদরের গোপাল কৈশোরে যুবার মত হইবে তাই বা আশ্চর্য্য কি? গোয়ালার ছেলে বড় বাড়ন্ত।' * * * 'সকল বিষয়েই যে অসাধারণ, সে রাসলীলার সময় তবে সাধারণ বালকবৎ থাকিবে কেন?' এই অসাধারণতার ভাব কেবল যে সমালোচকের মনেই উদিত হইয়াছে তাহা নহে। উপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের সংশয় প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। সে সংশয় উপাধ্যায় মহাশয়ের নহে; কিন্তু যাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন সেই সকল শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের। উপা-

ধ্যায় মহাশয় নিজের মত স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন যথা 'কিশোর অবস্থার সম্মাননার' অর্থ কি? টীকাকার স্বামী 'কিশোর বয়সোচিত চাপল্য অনুকরণ' কিশোরাবস্থার সম্মাননার অর্থ করিয়াছেন। এ অর্থে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তবে যদি এ চাপল্যের মধ্যে তদ্বয়সোচিত ব্যবহারের বিপরীত কিছু থাকে, তাহা হইলে এ অর্থে সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় না। কিশোরাবস্থা সম্মাননার অর্থ তৎকালোচিত ধর্ম্মরক্ষা করিয়া বালচাপল্য প্রকাশ। তবে সংশয়ের বিষয় এই, যদি এ প্রকারই হয় তবে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত উভয়কেই কৃষ্ণের নির্দ্দোষত্ব রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে কেন বাধ্য হইতে হইয়াছিল? তিনি গোপীগণ এবং তাহাদিগের ভর্ত্তৃসমূহের আত্মা হইয়া বিরাজ করিতেন, অতএব গোপীগণ সহকারে স্বেচ্ছাচরণে প্রবৃত্তিতে কোন দোষ পড়িতেছে না, এ যুক্তি আনাতেই ভিতরে কিছু গোল ছিল বুঝা যায়।' এই কয়েকটী কথা দ্বারা উপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের অযথা অন্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তত্রচ সমালোচক মহাশয় 'তিনি শাস্ত্রের প্রতি অযথা আসক্তি এবং কৃষ্ণের প্রতি অযথা সম্মান করিয়াছেন' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্য্য! পূতনা যে রাক্ষসী নয়, কালিয়দমন যে বালকোচিত চপলতা এবং গোবর্দ্ধনধারণ যে বাস্তবিক গোবর্দ্ধনধারণ নয়, কেবল একটী গহ্বরের ভিতরে গোপগোপীগণকে সমাশ্রিত করিয়া রক্ষা করা, এই সকল বিষয় উপাধ্যায় মহাশয় তদ্রচিত গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

"'স্বামী যে কয়েকটী যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমটী কৃষ্ণের অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিতেছে, দ্বিতীয়টী নিজের কোন অভিলাষ নাই কেবল গোপীগণকে আমোদিত করিবার জন্ম তিনি রাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন দেখাইতেছে, তৃতীয়টী তাঁহার কামবিজয়িত্ব এবং চতুর্থটীতে একবারে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-বিকারের গন্ধমাত্র ছিল না প্রকাশ করিতেছে। স্বামীর এ প্রকার সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্পিত নহে, কেন না রাস পঞ্চাধ্যায় এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণের ব্রজবধূগণের সঙ্গে এই রাসবিহার শ্রবণ ও বর্ণন করিলে ভক্তি হয়, হৃদ্রোগ কাম আশু বিনষ্ট হয়।' এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক ব্রহ্মবাদী উপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অতিশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, কিন্তু এ সকল কথা উপাধ্যায় মহাশয়ের নহে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন সেই সকল শাস্ত্রপ্রণেতাদিগের ঐ সকল কথা। যাঁহারা কৃষ্ণেতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার প্রতি অসাধারণত্ব প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারাও যে কৃষ্ণকে অবৈধ ইন্দ্রিয়বিকারে পতিত হইতে দেখিতে অসন্তুষ্ট, এই সকল সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে এবং উপাধ্যায় মহাশয়ও তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। রাসে যে কোন প্রকারের ইন্দ্রিয়বিকারের গন্ধও ছিল না, অথবা অন্য কোনরূপ ব্যভিচার দোষ দৃষ্ট হয় নাই তাহা উপরিস্থ স্বামীর টীকাপাঠেও স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। যাঁহারা ব্যভিচারের আশঙ্কা করিয়াছেন তাঁহারাই আবার ব্যভি-চারদোষনিরশন করিয়াছেন, ইহা দেখানও কি উপাধ্যায় মহাশয়ের পক্ষে অযুক্ত ?

"সমালোচক মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন, 'উপাধ্যায় মহা-

শয়ের প্রদর্শিত শাস্ত্রীয়প্রমাণ এবং এইরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার সিদ্ধান্তকে উপহাসের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে, যথা শ্রীচৈতন্যের শিষ্য "গোস্বামিগণ বিধানালোকে যে সমস্ত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন তৎপ্রতি সহজে সকলের আস্থা সমুপস্থিত হইবে। কৃষ্ণের বয়স সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্রজে পূর্ণ কৈশোরব্যাপী লীলা জানিবে।" * * * "এখানে উপাধ্যায় মহাশয় বড়ই গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।" বস্তুতঃ উপাধ্যায় মহাশয় কিছুই গোলমাল করেন নাই কিন্তু শাস্ত্রানভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত সমালোচকই মহাগোলযোগে পড়িয়া গিয়াছেন, কেন না উপাধ্যায় মহাশয় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, চৈতন্যের শিষ্য বৈষ্ণবগণ ব্রজে পূর্ণ কৈশোরব্যাপী লীলা স্বীকার করেন, কিন্তু সেই পূর্ণ কৈশোর একাদশ বৎসরের মধ্যেই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবগণের যে স্বীকার তাহা উপাধ্যায় মহাশয় স্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা 'এই সকল প্রমাণে পূর্ণ কৈশোর কাল ব্রজে অবস্থিতি স্থাপন করিয়া একাদশ বর্ষই যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে কৈশোর ছিল ইহা সন্দর্ভকারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। * * * কৃষ্ণ সন্দর্ভের এই লেখা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের একাদশ বর্ষকাল ব্রজে স্থিতি গোস্বামিগণ কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।' উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সকল কথা বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কৃষ্ণেতে ঈশ্বরত্ব আরোপের প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শন করিতেছে, এবং একাদশ বৎসরের কার্য্য সাধারণ বালকোচিত কার্য্য বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করেন, ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। তবে আর উপাধ্যায় মহাশয় গোলমাল করিলেন কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণকে বাল্যকালে অর্থাৎ একাদশ বর্ষ বয়সে 'সম্পূর্ণ

বৈরাগী, ব্রহ্মচারী, নির্লিপ্ত প্রেমিক' ইত্যাদি বলা যে উপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি নহে, তাহা যে শাস্ত্রকারগণের, একথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি, তবে বিশেষ কথা এই আমাদের উপাধ্যায় মহাশয় এই সমস্ত বিশেষণের সম্পূর্ণ বিরোধী নহেন। তাঁহার মত এই যে, শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বৎসরের বালক বটেন, অন্যান্য বালকে এই বয়সে এই সমস্ত বিষয় যেরূপ ভাবে প্রকাশ পাইত শ্রীকৃষ্ণেতে তাহা হইতে অনেক গুণ বেশী প্রকাশ হইয়াছিল; পার্থিব আমোদ প্রমোদে বাল্যকাল হইতেই একরূপ তিনি উদাসীন ছিলেন, কিন্তু গোপগোপীগণকে তাঁহার নিজের কার্য্য দ্বারা তিনি সর্ব্বদা আমোদিত রাখিতেন, নিজে সে সমস্ত হইতে প্রায়ই নির্লিপ্ত থাকিতেন, ইহাই উপাধ্যায় মহাশয়ের বলিবার বিষয়। সাধকজীবন যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় আমাদের উপাধ্যায় মহাশয়কে কখনই এজন্য উপহাস করিবেন না, কেন না সাধকজীবনে এ প্রকার ভাব বড় দুর্লভ নহে। সমালোচক মহাশয়ের ব্যঙ্গোক্তি কিসে আসিল কে বলিবে?

"উপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থস্থ 'আপনাতে সৌরতে বদ্ধ রাখিয়া' এবং 'উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং' ইত্যাদি কথার প্রতি সমালোচক মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন:—'* * * উপাধ্যায় মহাশয় এই স্থানটিতে আদিরসের বেশ ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এক দিকে স্বামীর টীকার দোষ ধরিয়া শাস্ত্রের অবমাননা করিয়াছেন, অপর দিকে সহজ জ্ঞান, সদ্‌যুক্তি ও সদ্বিবেচনার অবমাননা করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণের উপর অযথা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।' এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে যাহা

লিখিত আছে উপাধ্যায় মহাশয় তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা শ্লীল কি অশ্লীল বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই। বিশেষতঃ অশ্লীল বলিয়া পরিচিত যে রাসলীলা তৎসম্বন্ধীয় সকল প্রমাণাদিও যে ঐরূপই হইবে তাহার আর অন্যথা করিবারও উপায় নাই। এই সকল স্থলে সমালোচক মহাশয় আদিরসের কথা মনে স্থান দিয়া নিজেকেই কলঙ্কিত করিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় স্বামীর টীকার দোষ ধরিয়া শাস্ত্রের অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া সমালোচক উপাধ্যায় মহাশয়কে অবজ্ঞা করিয়াছেন। সমালোচক মহাশয়ের সমালোচনার এই স্থানটি পাঠ করিলে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের উপর সহজেই সন্দেহ জন্মে, কেন না স্বামীর টীকা শাস্ত্র নহে, ভাগবত শাস্ত্র। স্বামীর টীকা শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যামাত্র। কাজেই শাস্ত্রের অবমাননা কোনরূপেই হয় নাই, কেবল ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে ভুল বা অন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই মাত্র বলিয়াছেন। ইহাতে শাস্ত্রের অবমাননা হইল কিরূপে? সহজ জ্ঞান ও সদ্‌যুক্তি প্রভৃতির প্রতি অবমাননা করিয়া উপাধ্যায় মহাশয় কিরূপে অযথারূপে শাস্ত্রপ্রমাণের প্রতি আসক্ত, ইহা বোধ হয় সমালোচক মহাশয় প্রদর্শন করিতে অক্ষম। নেহাত গালাগালী দেওয়ার দরকার বলিয়াই এরূপ অযৌক্তিক কথা বলিতেছেন।

"'এই প্রকৃতি আমার যোনি * * * আমি বীজপ্রদ পিতা' শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সমালোচক ব্রহ্মবাদী বড়ই বিড়ম্বিত হইয়াছেন। তিনি যে এর অর্থ বুঝিতে লালায়িত এটি বড়ই সুখের বিষয়, কেন না ভ্রান্তি সকলেরই আছে, কিন্তু অর্থ না বুঝিয়া মন্তব্য করাতেই আমরা

দুঃখিত হইয়াছি। এখানে কেবল 'আমি' (অহং) এই কথার অর্থ বুঝিলেই প্রচুর হইবে। যদি না হয় তবে বারান্তরে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া যাইবে।

"ইহার অর্থ এই :—পরোক্ষ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শনই এখানে 'অহং' এই শব্দের অর্থ। 'শাস্ত্র দৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ।"—পূর্ব্ববর্ত্তী উপদেষ্টৃগণ এই প্রকার উপদেশ দান কালে 'অহং' শব্দ দ্বারা পরমাত্মার প্রত্যক্ষতা প্রদর্শন করিতেন, কৃষ্ণও তাহাই করিয়াছেন।

"সমালোচক মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন যে 'এক্ষণে দেখা যাউক কৃষ্ণচরিত্রকে তিনি কিরূপ আকারে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি যথেষ্ট, তাঁহাকে তিনি যোগাচার্য্য, ব্রহ্মচারী, ডেমিগড, বৈরাগ্যাবৃত প্রেমে এবং তরঙ্গবর্জ্জিত প্রেমে প্রেমিক, ধর্ম্মসমন্বয়কারী বলেন। কিন্তু যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপাঠে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, শ্রীকৃষ্ণ একজন বৃজরুগ, স্বভাববিরুদ্ধ অলৌকিককর্ম্মকারী, শত্রুঘাতক বীর, চতুর শঠ মন্ত্রী, অন্যায় যুদ্ধে বিপক্ষ হননকারী, তিনি মহাক্রোধবশতঃ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেন, ছল প্রতারণা দ্বারা ধার্ম্মিকদিগকে অসত্যাচরণে স্পষ্ট বিধি দেন, বহু বিবাহকারী এবং বহু সন্তানের জন্মদাতা, বেশ্যার নৃত্যগীতের সহিত স্ত্রীগণ সঙ্গে জল বিহার করিয়াছেন, পুত্র পৌত্রদিগকে বারবধূর সঙ্গে প্রণয়ে উৎসাহ দিয়াছেন, নৈতিক চরিত্র ইহা দ্বারা কেমন পবিত্র হইয়াছে গ্রন্থকার তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এরূপ চরিত্রে যেখানে সেখানে নববিধানের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করাটা ভাল হয় নাই।' এই সকল অকথ্য উক্তি দ্বারা নির্দ্দোষ কৃষ্ণ বেচারীকে অন্যায়রূপে সমা-

লোচক আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু বিধানপ্রবর্ত্তককর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষরূপে গৃহীত হইয়াছেন, এজন্য বোধ হয় এই ব্রহ্মবাদী সমালোচক—হয় নববিধানের বিরোধী—না হয় নববিধান অনভিজ্ঞ; তাহা না হইলে এক জন মহাপুরুষকে অকারণে এরূপ কুৎসিত ভাষায় তিরস্কার করিতে কোন নববিধান-বিশ্বাসী পারেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। মনুষ্য-মাত্রেরই চরিত্রে দোষ থাকিতে পারে। যত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সকলেই মানুষ, তবে কৃষ্ণচরিত্রে দোষ থাকিবে এ আর বিচিত্র কি? পৃথিবীতে নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করার আশা জীবের পক্ষে দুরাশামাত্র। ইহা জানিয়া নববিধানবিশ্বাসিগণ কোন মহাপুরুষের চরিত্রে দোষাংশ সন্ধান না করিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যাংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি আমরা দোষগুণ তুল্যরূপে বিচার করিয়া মহাপুরুষদিগকে গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় হইতে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহার চরিত্র তুলনা করিলে ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মও গৃহীত হইতে পারে না। তবে মহৎ লোকের ছিদ্র অনুসন্ধান করাই পাপ, এজন্যই এ সব বিষয়ের প্রসঙ্গ আমরা এখানে আর বেশী করিতে চাই না।

শ্রীকৃষ্ণকে বহুবিবাহকারী বলিয়া সমালোচক অনেক নিন্দা করিয়াছেন। সমালোচক যদি কুলিন ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা হইলে ইহার সার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিশেষ পারদর্শী হইতেন; অথবা যদি তাহাই হইয়া থাকেন তবে বোধ হয় নিতান্ত দারিদ্র্যবশতই তাঁহার ভাগ্যে দুইটী ঘটে নাই, অথবা বিবাহের পূর্ব্বেই ব্রহ্মবাদী হইয়াছেন সেই জন্যই বহু বিবাহে এত

রাগ। এখনও এমত অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহার স্কন্ধে দুইটী সহধর্ম্মিণী যুগপৎ আছেন। বাস্তবিক পক্ষে এইটীই দুঃখের ও সমালোচনার বিষয় বটে। তবে কৃষ্ণ যে সময়ের লোক সে সময় বহুবিবাহের হস্ত হইতে মুক্ত অর্থাৎ সামাজিক বন্ধন অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে সহজ বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। পূর্ব্ব কালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এই শাস্ত্র আবিষ্কৃত করিয়াছেন। 'স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা ব্যপাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং। তেন অর্দ্ধবৃগলমিব স ইতি।' এই যাজ্ঞবল্ক্যেরও ক্যাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নামে দুইটী স্ত্রী ছিল। কাজেই এখানে আমরা তাৎকালিক সামাজিক প্রথার বল যে অনতিক্রমণীয় তাহা অতি সহজে বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং কৃষ্ণকে দোষী করিয়া আর কি করিব।

"সমালোচক হজরত মহম্মদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে তুলিত করিয়া উপহাস করিয়াছেন। নববিধানের বিধিমতে মহম্মদও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া গৃহীত, এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাই, সুতরাং এ তুলনাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তবে অকারণে মহাপুরুষের প্রতি যিনি উপহাস করিবেন তাঁহার সঙ্গে আমাদের সহানুভূতিও নাই।

"শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর অপূর্ব্ব দাম্পত্যের কথায় সমালোচক মহাশয় বড়ই সচকিত হইয়াছেন, এতে আমাদেরও বড় হাসি পাইল। মূল কথা সমালোচক ভাগবতাদি গ্রন্থে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাই এত উপহাস ও কটূক্তি প্রয়োগ। সমালোচক মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করিয়া তাঁহার বিদ্যার মধ্যে কেবল কটূক্তি ও অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছেন ইহাই দেখা গেল।

বাস্তবিক কৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মপাঠ করিয়া মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিতে এখনও তাঁহার ঢের দিন বাকী আছে, ভাগবত পাঠ করিলে এই গভীর দাম্পত্যের প্রমাণ পাইবেন।

"দ্রৌপদীর সতীত্বসম্বন্ধে উপাধ্যায় মহাশয়ও কিছুই বলেন নাই কাজেই আমাদেরও কিছু বলিবার নাই। শাস্ত্রাদি গ্রন্থে দ্রৌপদীকে সতী এবং নিষ্ঠাবতী স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে আমাদেরও কোন আপত্তি নাই। দ্রৌপদীর সতীত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সমালোচক মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরই অযথা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যে সমালোচক কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শাস্ত্রের জন্য 'হা হতোস্মি' বলিয়া আকুল হইতেছিলেন, এখন দেখি তিনিই আবার শাস্ত্রের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতেছেন, বড়ই লজ্জার বিষয়?

"শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রসমরে যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াও প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার সুহৃৎ-পারবশ্যাতিশয্য বশতই হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য বধের নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলাইতে শ্রীকৃষ্ণ যে প্ররোচনা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা তৎকালোচিত ক্ষত্রিয়সমাজের সাধারণ প্রথা। ঐ সকল প্রথার অনুগমন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নহে। দুষ্ট দমন শিষ্টপালনই রাজনীতির উদ্দেশ্য; তাহা পালন করিতে প্রাচীন কালের রাজনীতিবেত্তৃগণ অনেক সময় অসদুপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন, পুরাণাদি পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের পক্ষে এটি হওয়া আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচনা করেন তখন মনু প্রভৃতির অনুশাসন দেখাইয়া করিয়াছেন, নিজের

কথায় নয়। শ্রীকৃষ্ণ যে এই উপায়ে যুধিষ্ঠিরের দৌর্ব্বল্য সুচিকিৎসকের মত জনচক্ষুর্গোচর করিয়াছেন একথা অভিব্যক্ত করিতে উপাধ্যায় মহাশয় বিস্মৃত হন নাই। তিনি লিখিয়াছেন 'যুধিষ্ঠির সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এক কৌশলে তাঁহার অভিমান ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। অর্জ্জুন যে কথায় সায় দিলেন না, যুধিষ্ঠির জয়ের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাহাই করিলেন। তাঁহার যে এ দুর্ব্বলতা ছিল শ্রীকৃষ্ণ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, তাই তিনি সব সময়ে তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়াছেন, আপনার কর্ম্মও স্থৈর্য্য লাভ করে নাই শত্রু ও পরাজিত হয় নাই।'"

"শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহার পুত্রগণকে বারবধূগণের সহিত প্রণয়ে উৎসাহ দিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা বেশী কিছু বলিতে চাই না। তবে একেবারে কিছু না বলাও ভাল নয় বলিয়া কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ নিতান্ত দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল, ভয়ানক চরিত্রদোষে তাহারা কলুষিত হইতে লাগিল এবং তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জের সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা তিনি আশঙ্কা করিলেন তখন একেবারে অনন্যোপায় হইয়াই যে এই কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রজারঞ্জনই রাজার কর্ত্তব্য, এই জন্যই কেবল প্রজার সুখ ও শান্তির জন্য তিনি একার্য্যে সন্তানগণকে ব্রতী করিয়াছিলেন। এতে বোধহয় রাজধর্ম্মের ব্যাঘাতে হয় নাই।

"দ্রৌপদীপ্রদত্ত শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরিতৃপ্ত হইলেন আর দুর্ব্বাসা ও তৎসহ আগত শিষ্যগণ ক্ষুধানিবৃত্তিলাভ করিলেন

এই স্থানটী প'ড়িয়া আমাদের ইচ্ছা শক্তির (Willforce) কথা মনে হইল। যদিও উপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নাই তথাপি এই গ্রন্থের অন্যত্র অর্থাৎ ১৪১ পৃষ্ঠায় 'ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে সেই সময়ের জন্য চক্ষুলাভ করিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।' এই স্থানের নীচের নোটে সম্যকরূপে এই ইচ্ছাশক্তিকে পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছেন। বিশেষ আমরা ডাক্তর কারপেণ্টারের (Dr Carpenter) আবিষ্কৃত Law of Expectancyতে ইহাই প্রমাণিতরূপে দেখিতে পাই যে, এক জন আপনার ইচ্ছাশক্তি (willforce) দ্বারা অন্যের প্রতি যে প্রকার ভাবাদির উদ্গমন করিতে ইচ্ছা করেন সেইরূপ তাহার মনে ভাবাদি উদ্ভূত করিতে পারেন। উক্ত প্রসিদ্ধ ডাক্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বলবান্ ব্যক্তি যে ভারী বস্তুটি উত্তোলন করিতে পারে না, নিতান্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি সেই বস্তুটি "এই একটী পালক" এই বলাতে অমনি একটী অঙ্গুলির উপর ধারণ করিয়া তাহাকে ঘুরাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এইরূপ জলাদি বস্তুকে মদ্যাদিরূপে তাহাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন তাহারাও মদ্য মনে করিয়া তাহা পান করিয়া মদ্যের স্বাদ অনুভব করিয়াছে। ইচ্ছশক্তির (willforce) এইযে প্রবলতর ক্ষমতা| তাহা Psychological Society দ্বারা এখনও পরীক্ষিত হইতেছে। যদি এই সব পরীক্ষা কালে বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তাহা তাহা হইলে যোগীদিগের সম্বন্ধে যে সব অদ্ভুত প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, উহাদের কারণ জনসমাজের গোচর হইতে পারে। এখনও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সম্পূর্ণ বিজ্ঞানরূপে পরিণত হয় নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে

উপাধ্যায় মহাশয় স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। যখন 'সকলে পরিতৃপ্ত হউক' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শাকান্ন গ্রহণ করিলেন, হইতে পারে তাঁহার ইচ্ছা শক্তি (will force) দুর্ব্বাসা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ক্ষুধামান্দ্য জন্মাইয়াছিল।

"সমালোচক মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন:—'যাহা হউক কৃষ্ণোক্তি তত্ত্ব কথা অতি গভীর এবং সারবান্ হইলেও তাঁহার জীবনচরিত মধ্যে কোথায়ও যোগ কি বৈরাগ্য, ভক্তি কি যোগের অসাধারণত্ব দেখিতে পাইলাম না।'

"এ বিষয় উপাধ্যায় মহাশয় অতি সুন্দররূপে তদ্রচিত গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। 'শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া জলস্পর্শ করতঃ স্থিরচিত্ত হইয়া প্রকৃতির অতীত সেই পরমাত্মাকে ধ্যান করিলেন, যিনি এক স্বয়ং জ্যোতি, নিরুপাধি, ক্ষয়াদিশূন্য, আপনাতে অবস্থিত পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার কলুষ হইতে নিবৃত্ত, ব্রহ্মনামে প্রসিদ্ধ, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত আত্মশক্তিযোগে যাঁহার সত্তা ও আনন্দরূপ লক্ষিত। অনন্তর নির্ম্মল জলে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক সোত্তরীয় বসন পরিধান করতঃ সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিলেন এবং অগ্নিতে আহুতি দান পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া গায়ত্রীজপ করিতে লাগিলেন ইত্যাদি' এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকাল হইলে পুনরায় নিদ্রার কাল পর্য্যন্ত সমুদয় ধর্ম্মজীবন সংক্রান্ত দৈনিক কৃত্য গ্রন্থকর্ত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং গ্রন্থের শেষভাগে বেদ বেদান্ত ও পুরাণ তৎকাল প্রচলিত এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম বিভাগত্রয়ের যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে

তিনি সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকর্ত্তা অতি বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। অথচ সমালোচক তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্ম সমন্বয়সম্বন্ধে কোন কথা দেখিতে পান নাই, এ বোধ হয় বুদ্ধির অভাব। সমালোচক মহাশয় ঈশার মতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অদ্বৈত-বাদের তুলনা দেখিয়া রুষ্ট হইয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—'আমাতে সমুদয় ভূতগণ, সমুদয় ভূতগণকে লইয়া আমি ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর আমাতে এবং সমুদয় ভূতগণেতে" ইত্যাদি উপদেশ যাহা শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন তাহা 'আমি পিতাতে এবং পিতা আমাতে, এবং তোমরা আমাতে এবং আমি তোমাদিগেতে' ঈশার এই উক্তির সঙ্গে যে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইয়াছে ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন ? এবিষয়ে কেশববাবুর মতও কিঞ্চিৎ পরে আমরা উদ্ধৃত করিব।

"শ্রীকৃষ্ণ মারামারি কাটাকাটির ভিতরেও নির্লিপ্ততার উপদেশ দিয়াছেন, অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন এবং স্বয়ং প্ররোচক হইয়া অর্জ্জুন দ্বারা যুদ্ধ করাইয়াছেন, কিন্তু তাহার ভিতরেও অর্জ্জুনকে নির্লিপ্ত না থাকিয়া যুদ্ধ করিতে শত শত বার নিষেধ করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি এই প্রকার নির্লিপ্ত ভাব রক্ষা করিতে পারে, তাহাতে সমালোচকের কি আপত্তি উত্থাপন হইতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রভৃতিরা সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে অবস্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি যখন ভগবদ্গীতার বিষয় উপদেশ দেন তখন তিনি ব্রহ্মাধিষ্ঠিত হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎপরে অশ্বমেধ পর্ব্বে অনুগীতাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি যে তখন ব্রহ্মাধিষ্ঠিত

ছিলেন না এটি প্রকাশ করিয়াছেন। এবিষয়ে যুধিষ্ঠিরাদির দোষ কি গুণ তাহা তাঁহারাই জানেন কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় এখানে স্পষ্ট প্রভেদ দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ যে কেন আপনাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়াছেন ইহা সমালোচক বুঝিতে পারেন নাই।

"নববিধানোপাধ্যায় মহাশয় কেশবচন্দ্রের ভাবে পরিচালিত হইয়া এ পুস্তক লিখিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার জ্ঞানস্থানীয় ইত্যাদি বিষয় যে স্বরচিত গ্রন্থের অবতরণিকায় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা দেখিয়া সমালোচক ব্রহ্মবাদী একেবারে জেলে বেগুনে জলিয়া উঠিয়াছেন। আশ্চর্য্য আর কি! এতে স্পষ্টই বোধ হয় কেশববাবুর কথাবার্ত্তার সঙ্গে বুঝি সমালোচকের বড় সাক্ষাৎ নাই। বিধানাচার্য্য মহাত্মা শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন সেবকের নিবেদনের ১ম ও ২য় খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় "একাধারে নরনারীর প্রকৃতি" নামক ১৮০২ শকের ১৮ই আশ্বিন রবিবারের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন :—"হিন্দুস্থানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ নরনারীদিগের মধ্যে প্রেমবিস্তার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম শুনা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা এই দুইটী নামের প্রতি কি ব্রাহ্মদিগের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই? যাঁহা-দিগের নামে সমস্ত ভারতে এত প্রেমানুরাগ, ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগের প্রতি কেন শ্রদ্ধাবিহীন? যে সকল ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্তি সাধন করেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই দুইটী নাম বিশেষ আদরণীয় কেন না হইবে? ব্রাহ্মেরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনে ব্রহ্মের কত রূপ দেখিলেন, রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কি কোন

দেবভাব দৃষ্ট হয় না?" ইত্যাদি। আবার দেখিতে পাই, ১৮৮১ সনের ৯ই জুনের New Dispensation এর ২ পৃষ্ঠায় "Krishna's Transfiguration" নামক প্রস্তাবে তিনি লিখিয়াছেন.........

..."We read in Mathew that "After six days Jesus taketh Peter, James and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart."

"And was transfigured before them : and his face did shine as the sun, and his raiment was white as light."

"It is a curious coincidence that this Spiritual vision is spoken of also in the Hindu scriptures. The Bhagabat Gita thus describes Krishna's Transfiguration. Arjun says,

Show me then
Thy form celestial, most divine of men,
If haply I may dare to look upon it.
& & &"

দ্বিতীয়তঃ ১৮৮১ সনের ২২সে জুলাইর New Dispensation এর 'Incarnation' নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছেন : "In Hinduism God Himself appears on earth as man. The Avatar is the identical Creator of the universe, the Infinite Supreme Brahm Himself. In Christianity it is the Son of God we see in History. Not the Creator, the Unborn, Eternal, but the First-Begotton Son. The Hindu identifies the Lord of Heaven and the Avatar on earth in an essential and indivisible unity, recognising no distinction and repudiating the very possibility

of a difference.........In Hindu theology Krishna is the very God of the universe..... ...Krishna is nothing if not the Almighty God. Christ is nothing if not the son of God. It is heresy to talk of Krishna as the son. It is heresy to accept or preach Christ as the father. Christ never said, I am God." এ সত্ত্বেও সমালোচক কেন উপাধ্যায় মহাশয়কে গালাগালি করিয়াছেন বুঝিতে পারি না।

"উপসংহার কালে আমাদের বক্তব্য এই যে সমালোচক মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" নামক গ্রন্থখানির সমালোচনা করিতে গিয়া, সুশোভিত মনোহর অট্টালিকার ভিতরে একটি পিপীলিকার মতন কার্য্য করিয়াছেন, অর্থাৎ সুশোভিত অট্টালিকায় পিপীলিকা প্রবেশ করিয়া যেমন তাহার শোভা অনুভব না করিয়া সেখানেও কেবল আত্মগোপনের জন্য ছিদ্রই অনুসন্ধান করে, সেই রূপ আমাদের সমালোচক ব্রহ্মবাদী মহাশয়ও সূক্ষ্মদর্শী হইয়া পুস্তক খানির সৌন্দর্য্যের দিকে একবারে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া কেবল ছিদ্রই খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সে যত্ন বিফল হইয়াছে। বস্তুর সারতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা বশতঃ যে সমস্ত তিনি অসার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতেও যথেষ্ট সারত্বের বিকাশ দেখা যাইতেছে। তিনি আরও বিশেষ হাস্যাস্পদ হইয়াছেন এই জন্য যে চৈতন্য যখন প্রেমের ঢলা ঢলি করিয়া হরিনামের স্রোতে শান্তিপুর ভাসাইতেছিলেন, তখন যেরূপ চিরঞ্জীব শর্ম্মা বর্ত্তমান থাকিয়াও চৈতন্যের ভক্তি ও প্রেমকে একবারেই আস্বাদন করিলেন না কেবল নাচ গান এবং তামাক চুরুট খাইয়া অলীক আমোদ করিয়াই কাটাইলেন এবং

নিজ কুটিরে বসিয়া হুকা হস্তে লইয়াই ইহকাল পরকালের কত ঘটনা মনে মনে আঁকিলেন, তখনকার গভীর তত্ত্ব একবারেই মনে করিলেন না, সেই রূপ আমাদের সমালোচক মহাশয়ও স্বীয় চিন্তা প্রকোষ্ঠে নিয়ত মগ্ন থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের সমালোচনা করিতে যাইয়া কেবল ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্কই নাশ করিলেন এবং পুস্তকখানি হইতে কোন উপকারের পরিবর্ত্তে স্বকীয় দৌর্ব্বল্যতার জন্য কতকগুলি আবর্জ্জনামাত্রই গ্রহণ করিলেন কিন্তু কোন লাভই হইল না। সমালোচক বোধহয় মনে করেন তিনি শাস্ত্রজ্ঞানে একজন নিতান্ত পারদর্শী লোক, যদি বাস্তবিকই তাঁহার এ জ্ঞান থাকিয়া থাকে, তবে এভাব শীঘ্র দূর করিয়া পুনরায় শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; অথবা যদি বাস্তবিক পক্ষেই শাস্ত্রাভ্যাস থাকিয়া থাকে তবে আমরা তাঁহার সমালোচনার কোন অংশেই সে জ্ঞানের আভাস পাইলাম না। অথবা

"যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥"

আমরা পাঠক মহাশয়গণ সমীপে বিনীত ভাবে এই নিবেদন করি যে, এই পুস্তকখানা সম্যক্ বোধগম্য করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিশেষ জ্ঞান থাকার দরকার। তাঁহারা যেন এই সমস্ত শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল বাতুল সমালোচকগণের কথায় পুস্তক খানি না পড়িয়া তৎসম্বন্ধে কোন একটী মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী না হন।"

কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে হইলে, জনসমাজ যাহাতে তাঁহাকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার

জন্য তাঁহার কথায় তাঁহাকে সাধারণের নিকটে উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। আমরা যখন প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের জীবন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন তাঁহার যে সকল লিখিত বিষয়গুলি সাধারণের নিকটে উপস্থিত করিলে তিনি ঠিক যাহা তাহাই সকলে বুঝিতে পারেন, আমাদিগের আগাগোড়া সেই দিকে যত্ন। জীবন লেখকের সহিত স্বর্গগত প্রেরিতের যে অতি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিনি সংস্কৃত নবসংহিতার টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবনলেখককে আপনি যে স্থান দিয়াছিলেন সে স্থান লইতে লেখক অসম্মত বলিয়া তাঁহার লিখিত টীকার অপূর্ণাংশ আলোকের মুখ না দেখে, এই ভাবে উহাকে তিনি অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঈদৃশ সম্বন্ধানুভব করিয়াও আচার্য্যের বেদী অবমানিত হইল এই বোধে প্রেরিত কালীশঙ্কর কি তীব্রভাবে জীবনবৃত্তলেখককে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা জীবনবৃত্তান্তমধ্যে নিবিষ্ট করিতে তিনি বিমুখ হন নাই। এই আক্রমণের অনেক দিন পরে তিনি "সংস্কৃত নবসংহিতার" টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে মনে হইতে পারে, বেদীসম্বন্ধে তাঁহার তীব্রমত তখন আর ছিল না, কিন্তু যাঁহারা পর সময়ে তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব জানেন, তাঁহারা বলিবেন, সে মত তিনি কোন কালে পরিবর্ত্তিত করেন নাই। "সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা এ দুই বিরোধী সামগ্রী নয়" বিজ্ঞান রাজ্যের লুইসের এ কথা তাঁহার জীবনে যে সত্য হইয়াছিল তাহা এই ব্যাপারে প্রকাশ পাইতেছে। জীবনবৃত্তলেখককে যে ভাবে তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের" সমালোচককেও তিনি সেই ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং

সমালোচকের প্রতি যত টুকু শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখা বিধানসঙ্গত, তাহা যে তাঁহাতে ছিল না, একথা আমরা বলিতে সাহসী নহি। সেই সাহসকেই আমরা লোকের নিকটে নিন্দিত হইবার ভয়-সত্বেও সমালোচনার সমালোচনাটী জীবনবৃত্তের অন্তর্ভূত করিলাম। পাশ্চাত্য ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিতেও সমালোচনার সমালোচনায় কি প্রকার পাশ্চাত্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা সকলে এই প্রবন্ধে দেখিতে পাইবেন।

প্রেরিত কালীশঙ্করের লেখনী অবস্থার দাস ছিল না, উহা যে কোন অবস্থায় কার্য্য করিত। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লেখাই লিখিয়াছেন। সে সকল লেখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জীবনবৃত্তে দিতে গেলে ইহার কলেবর এত বাড়িয়া যায় যে, তাহার সমাবেশপক্ষে আমাদের সময় ও অবসর উভয়েরই নিতান্ত অসঙ্কুলন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের কিছু কিছু অংশ আমরা এই জীবন-বৃত্তে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। বন্ধুগণের অনুরোধ যে তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের প্রতি পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণজন্য সেই দুই ভাগ হইতেও কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দি। তৃতীয় ভাগে সর্ব্বপ্রথমে একত্ব স্বাতন্ত্র্য-ব্যক্তিত্ব ও-পারতন্ত্র্য-ঘটিত বিচার দ্বারা মনুষ্যত্ব কি উহাই লিখিত হইয়াছে, তৎপর ব্রহ্মবস্তুকে ভৌতিক বস্তু হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রথমে শক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই শক্তি সর্ব্ববিধ সামর্থ্যের আধার ও ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য না হইলে শক্তিমধ্যে অভিহিত হইতে পারেন না, এইটি দেখাইয়া এক শক্তি হইতে জ্ঞানাদি সমুদায় স্বরূপ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে ; তৎপর ঈশ্বরদর্শন, মনুষ্যের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ, বিশ্বাস, এই বিষয়গুলি অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তৎপর বিশ্বাস যে অপৌত্তলিক ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রেরিত কালীশঙ্কর ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নানক, শাক্য, কবীর, শ্রীগৌরাঙ্গ, এব্রাহিম, মুষা, ঈশা, দাউদ, মোহম্মদ এই সকল মহাত্মার প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। পৌত্তলিকতা কার্পণ্য, ঈশ্বরের ত্রিবিধ ভাব, বিধাতা, বিধান প্রভৃতি বিষয়গুলি যে ইহাতে অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ কথা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সংক্ষেপে তৃতীয়ভাগের সার সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এ জন্য উহার উপসংহার আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"মনুষ্যত্ববিষয়ক প্রস্তাবে জানা গিয়াছে, মনুষ্যেত্বেই ভগবানের প্রকাশ। মনুষ্যের সঙ্গে ভগবানের যে সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে মনুষ্য জ্ঞাতা ভগবান্ জ্ঞেয়। মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার জ্ঞাতা নাই। তার পরে জানা গিয়াছে মনুষ্য বেদ। মনুষ্যেতেই জ্ঞানরূপে ও শ্রুতিরূপে ব্রহ্মবাণী অবতরিত হয়, অন্য কোথাও নহে। তার পর জানা গিয়াছে, মনুষ্য শ্রীহরির বিহারভূমি, মনুষ্যকে লইয়া মনুষ্যহৃদয়েতেই ভক্তবৎসল ভগবান্ লীলা বিহারাদি করেন। তাহার পরে জানা গেল যে, ভগবান্ ফলদাতা মনুষ্য ভোক্তা। তিনি ক্রমাগত দান বিতরণ করিতেছেন, আর ভক্তপাইয়া কৃতকৃত্য হইতেছে। ভগবানের সঙ্গে মানুষের এই সকল সম্পর্ক কেমন মিষ্ট, কেমন উচ্চ, কেমন গৌরবের ইহা ভাবিলেও মনে আনন্দসঞ্চার হয়। দেবগণ যে সম্পর্কবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, ভগবান্ কীটোপম ক্ষুদ্র মনুষ্যকে সেই অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন, এ আনন্দ কি ধারণ করা যায়? কেবল তাহাই নহে শাস্ত্র আর

কাহার জন্য নহে, শাস্ত্রের উপযোগিতা অন্য কাহারও নাই, ইহা কেবল মনুষ্যের জন্য। শাস্ত্র যেমন মনুষ্যের জন্য তেমনি মনুষ্য আবার শাস্ত্রের জন্য। মনুষ্যই কেবল দৈববাণী শুনিতে পায়, বুঝিতে পারে, এবং বুঝিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে পারে। কিন্তু পশুর এ অধিকার নাই, পশুর শাস্ত্রজ্ঞান নাই—সে দৈববাণী শোনে না—বোঝে না, বুঝাইলেও বোঝে না এবং প্রতিপালন করিতে পারে না। কেবল পশু নহে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কেহই এ অধিকার পায় নাই। মনুষ্যের মধ্যেও অনেকে এই দেবদত্ত ধনে বঞ্চিত হওয়াতে পশুতুল্য হইয়া আছে। তাহারা শাস্ত্র জানে না, শাস্ত্র শোনে না—শাস্ত্র মানে না—শাস্ত্র বোঝে না, বুঝাইলেও বুঝিতে চাহে না। কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই অতুল্য অমূল্য অধিকার লাভ করিয়া তদ্দ্বারা জীবন সফল করিয়াছেন, এবং কীটতুল্য মানুষ হইয়া দেবতাদিগের সমান সম্মানভাজন হইয়াছেন।

"কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল মনুষ্যেতে ঈশ্বরের প্রকাশ হইবে কেন? সমস্ত বিশ্বরাজ্যেই তাঁহার প্রকাশ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, ফল, মূল, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সর্ব্বত্রই কেবল সেই বিশ্বাধিপতির প্রকাশ দেখিয়া বিমুগ্ধ হই। এ কথা সত্য বস্তুতই তাঁহার প্রকাশ সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু সে প্রকাশ কাহার নিকটে? কে তাহা বুঝিতে পারে? পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল প্রভৃতিরা কি ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করিতে সমর্থ? তাহাদের ভিতরে যে তাঁহার নিত্য আবির্ভাব রহিয়াছে, তাহাদের ভিতরে যে তাঁহার জীবন্ত জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত রহিয়াছে, তাহাদের ভিতরে যে তাঁহার অঙ্গুলী

প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছে, কে তাহা দেখে? কে তাহা বোঝে? বস্তুতঃ মনুষ্যই তাঁহার প্রকাশদর্শনে অধিকারী, মনুষ্য আপনাতে যেমন তাঁহার প্রকাশ অনুভব করে, অন্যত্রও মনুষ্যই তাঁহাকে দর্শন করে, মনুষ্যই তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হয়, সুতরাং অন্যত্র ভগবানের প্রকাশ থাকিলেও মনুষ্যেতেই তাহার পর্য্যাপ্তি। অতএব মনুষ্য ইহার জন্য দায়ী। মনুষ্যকে তিনি বুঝিতে বুঝাইতে, শুনিতে ও শুনাইতে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য যদি বুঝিয়াও না বোঝে ও না বুঝায়, মনুষ্য যদি শুনিয়াও না শোনে ও না শুনায়, সে জন্য সে দায়ী ও অপরাধী। যে দিন মনুষ্য মনুষ্যনাম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার দায়িত্ব বাড়িয়াছে। যদি তুমি এ অধিকার লাভ না করিতে চাও, এ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না চাও, চিরকাল তোমাকে পশুশ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকিতে হইবে। আর যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত থাক, তবে আজ তুমি পৃথিবীর নিম্ন-ভূমিতে থাকিলেও অল্প কাল মধ্যে স্বর্গের উচ্চ ভূমিতে দেবতা-দিগের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে। শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া শাসিত হইব, এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া অগ্রসর হও। যে শাস্ত্র জানে সে শাস্ত্রী, সে পণ্ডিত, সে ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ, অন্যথা মূর্খ।"

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের চতুর্থখণ্ড বিধানসমূহের সমন্বয়প্রদর্শন করি-বার উদ্দেশে লিখিত। এ বিষয়ে তিনি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়া-ছেন, স্বয়ং পাঠকগণ গ্রন্থপাঠ করিয়া তাহার বিচার করিবেন, আমাদের সে সম্বন্ধে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই ভাল। বিধান-সমুদায়ের নববিধানে সম্মিলন যে অংশে তিনি নৈপুণ্যসহকারে

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"বিধান সকল যখন একের পর অন্য, তার পর অন্য এইরূপ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন এক দিকে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানকে সমাদর করিয়া তাহার পোষণ করে, অন্য দিকে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানের ভিতরে যে সকল মানবীয় দোষ দৌর্ব্বল্য থাকে তাহা অস্বীকার করে। এব্রাহিমের জীবনের মূলধন নিত্য-সিদ্ধতা। বিনা সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এবং তাঁহার হস্তে জীবনের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহার শিক্ষা ও শাসন অঙ্গীকার করা নিত্যসিদ্ধতার লক্ষণ। এই লক্ষণ এব্রাহিমের যেমন ছিল অন্য কাহার সেরূপ ছিল না। ঈশ্বর হইতে নিরপেক্ষ শিক্ষা ও শাসন গ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যাদেশশ্রবণের বল অধিক থাকা প্রয়োজন। এব্রাহিমের তাহা ছিল, কিন্তু নীতিবিষয়িণী দৃষ্টি অনুজ্জ্বল ছিল। মুষা আসিয়া এব্রাহিমের প্রত্যাদেশশ্রবণকে নীতিযোগে পূর্ণ করিয়া, যাহা কিছু অনীতি তাহা অস্বীকার ও অনাদর করিয়াছিলেন। মুষ'র নীতি সকল অতি কঠোর ছিল, দেবকুমার যিশু আসিয়া তাহাতে প্রেমের কোমলতা মিলাইয়া তাহার কঠোরভাব দূর করিলেন। সুতরাং সেই সেই পার্থিব নীতি অস্বীকৃত হইয়া উচ্চ স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠিত হইল। মোহম্মদ ইঁহাদিগের প্রত্যেকের গৌরব ও উচ্চতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আবার অংশীবাদী বলিয়া বিরুদ্ধাচরণও করিয়াছেন।

"এ দেশে হিন্দুজাতির ভিতরে রাজর্ষি জানক, বলিতে হইবে, বিধানের প্রথম প্রবর্ত্তক; কেন না তিনি স্বয়ং প্রত্যাদিষ্ট ও

প্রচারক ছিলেন। নরনারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের জীবনে বিধানের লক্ষণ ছিল সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা অতি পূর্ব্বকালের ঘটনা বলিয়া বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। জনকের জীবন গৃহস্থ বৈরাগীর পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত ছিল। তিনি রাজা হইয়া ভোগবিলাসের ভিতরে থাকিয়াও অনাসক্ত বৈরাগী ছিলেন। এইটি তাঁহার জীবনের মূল ধন। এই মূল ধন তিনি প্রত্যাদেশ-বলে লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রবক্তা হইয়া অনেক মুনি-কুমারকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন। জনকের এই বিধান পূর্ণ করিবার জন্য যোগাচার্য্য কৃষ্ণের উদয়। জনকের সময়ের লোকেরা পৃথক্ পৃথক্ প্রণালীতে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থায় অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণ আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় তত্ত্বকে একত্র সমাবিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহাতে বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণাদির সমুদয় মত একত্র মিলিয়া এক নূতন ও সহজ পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জনকের ন্যায় কৃষ্ণও অহংবাদী যোগী ছিলেন। ইঁহারা ভক্তির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন নিদর্শন প্রদর্শন করেন নাই, সুতরাং মানবীয় পক্ষে জীবন্ত জীবন না থাকা প্রযুক্ত উহা অপরিস্ফুট অবস্থায় ছিল। ইহার পরে সমাজে কিছু ব্যভিচার প্রবল হওয়াতে বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন গৌতমের জন্ম হইল। বৈরাগ্যের উজ্জ্বল ও পরাক্রমশালী দৃষ্টান্তের জন্য গৌতম এক জন সম্রাটের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। গৌতম পূর্ব্ববর্ত্তী যোগতত্ত্ব ও মৌলিক প্রণালী সকল গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বৈদিক সমুদয় ক্রিয়াকলাপ ও দেবদেবীর অপ্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। এই জন্য তাঁহার যোগতত্ত্ব এক নূতন বস্তুরূপে প্রকাশিত হইল,

নূতন বস্তুর শোভা সৌন্দর্য্য নূতনরূপে প্রকাশ পাইল। যাহা হউক ইহা প্রেমের বিধান মহাভাবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইল; কেন না নির্ব্বাণ ব্যতীত নৈর্ম্মল্য সাধন ব্যতীত, এক কথায় চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভক্তিপ্রেমের অভ্যুদয় হইতে পারে না। চিত্ত নির্ম্মল হইলে বিশুদ্ধ হইলে অর্থাৎ বিষয়াকর্ষণরূপতরঙ্গবর্জ্জিত হইলে ভক্তিপ্রেমের সঞ্চার হইতে পারে। এই জন্য নির্ব্বাণের সংবাদ বৌদ্ধ বিধান আগে আসিয়া অনুতাপের শাস্ত্র, পবিত্রতার ফল প্রচার করিল। পরে প্রেমের অবতার গৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকূলে, পাপকুসংস্কারের প্রতিকূলে জন্ম গ্রহণ করিল, অন্য দিকে পুণ্য পবিত্রতা দ্বারা তাহার সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপন করিল। ঐশী শক্তি অবতরিত হইয়া কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে এই সকল যোগবিয়োগঘটিত গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিল এবং পরস্পরের সঙ্গে একমহত্ত্ব একতার ভাব প্রকটিত করিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নববিধানের অর্থ, "ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হইয়া তাঁহার কর্ম্মশীল হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া নূতন ভাবে গঠিত হওয়া, এবং সেই নব জীবন হইতে যে নূতনত্ব প্রকটিত হয় তাহা জগতে প্রচার করা।" পূর্ব্বোক্ত সাধুমহাজনগণের প্রত্যেক ঐশ্বরিক বলের উপর আত্মবিসর্জ্জন করিয়া তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীকে নূতন অলঙ্কার প্রদান করিয়া সজ্জিত করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত ইহাদিগের প্রত্যেক জীবন ও তৎপ্রসূত সত্য সমুদয় নববিধানের অন্তর্গত। কেশবচন্দ্র দেবপ্রেরণা অনুসারে এই সকল জীবন ও সত্য মিলাইয়া এক নূতন বস্তু প্রস্তুত করিলেন, তাহারই নাম নববিধান। ঐ সকল

বিধান বিধাতার হস্তগঠিত, এই জন্য উহাদিগের নাম বিধান, কিন্তু উহার কোনটিই পূর্ণ বিধান নহে, কিন্তু নববিধানরূপ পূর্ণ বস্তুর উপাদান। যখন সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ উপাদান মিলিত হইয়া বস্তু রচনা করিল, তখন আর তাহার একটিরও পার্থক্য রহিল না, সকল গুলি মিলিয়া এক বস্তুতে অদৃশ্য হইয়া গেল। যেমন হাইড্রোজন, ও অক্‌সিজন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু মিলিত হইয়া জলরূপে পরিণত হয়, জল হইবার পূর্ব্বে তাহারা পৃথক্ থাকে, জল হইলে আর দৃশ্যতঃ কাহার পৃথক্ নিদর্শন থাকে না, কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে বিযুক্ত করা যায় তাহা হইলে পৃথক্ করিয়া দেখান যাইতে পারে। সুতরাং জল যেমন কখন হাই-ড্রোজন ও অক্‌সিজন নামে পরিচিত হয় না, কেবল ঐ সকল বস্তু উপাদান হইয়া জল প্রস্তুত করে মাত্র, সেইরূপ অপূর্ণ অপর বিধান সকল উপাদানরূপে নববিধানকে পূর্ণ বিধানরূপে প্রস্তুত করিয়াছে। তবে হাইড্রোজন অক্‌সিজনের ন্যায় স্বীয় পার্থক্য রহিত হইয়া মিলিয়া গেলেও প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করা যায়। ঐ সকল বিধানে পূর্ণতা নাই, কেন না উহা নববিধানের পৃথক্ পৃথক্ উপাদানমাত্র। উপাদান বস্তু নহে, বস্তুর অংশ। সেই সকল উপাদানরূপ অংশ সঙ্কলিত করিয়া ভক্ত-বৎসল ভগবান্ কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে পূর্ণ বিধান নববিধান প্রকটিত করিয়াছেন। যেমন হাইড্রোজন ও অক্‌সিজন মিলাইলেও বৈদ্যু-তিক শক্তি ব্যতীত তাহা জলে পরিণত হয় না, ঠিক সেইরূপ নানা বিধান মিলাইলেও ঐশী শক্তির যোগ ব্যতীত নববিধান হইতে পারিত না। তাই সাক্ষাৎ ভগবান্ ভক্তহৃদয়ে শক্তি প্রয়োগ করিয়া বিধান রচনা করিয়াছেন, করিয়া জগতে অবতারিত করিয়াছেন।"

স্বর্গারোহণ।

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের রোগশয্যা তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইয়াছিল। তাঁহার দেহের নিম্নার্দ্ধভাগ ক্রিয়াশূন্য হইয়াছিল, এবং সেই ক্রিয়াশূন্যতাই যেন দেহের ঊর্দ্ধতম ভাগের ক্রিয়াধিক্য উৎপন্ন করিয়াছিল। কোন এক ইন্দ্রিয় হীন হইলে যেমন অপরেন্দ্রিয়ের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার দেহসম্বন্ধেও সেই প্রকার হইয়াছিল। তিনি পদসঞ্চারণে অসমর্থ হইলেন, কোথাও যাইবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু হস্ত তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা সত্বর হইল, অবিশ্রান্ত লেখনীসঞ্চালনে তাঁহাকে ব্যস্ত রাখিল। মেরুদণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তী স্থূল স্নায়ু ছিন্ন হইয়া দেহার্দ্ধকে অচল ও বিবিধ যন্ত্রণার অধীন করিল, কিন্তু স্নায়ুর মূলগ্রন্থি মস্তিষ্ক পূর্ব্বাপেক্ষা সতেজ হইয়া উঠিল। কোথায় উদ্যম, উৎসাহ, কার্য্যশীলতা, দুরারোগ্য কঠিন রোগের আঘাতে অন্তর্হিত হইবে, তাহা না হইয়া ঐ সকল আরও দ্বিগুণিত হইল। তিনি যদি রোগশয্যায় দীর্ঘকালের জন্য শয়ন করিয়া জীবনশেষ না করিতেন, তাঁহার ভিতর কি যে এক অদ্ভুত তেজস্বিতা ও অবস্থাজয়করিবার সামর্থ্য ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারও অবসর হইত না। সামান্য একটি রোগ আমাদের আক্রমণ করিলে, আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি, কতক দিন বিশ্রাম না করিয়া আর আমরা কোন কার্য্য করিতে পারি না, কিন্তু তিনি কিঞ্চিদধিক-তিন-মাস ন্যূন চারি বৎসর রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পৃথিবীকে দেখাইয়া গেলন, ভগবদনুরক্ত ব্যক্তির ভগবৎসেবার ব্যাঘাত দুর্ব্বিষহ যাতনাপ্রদ ব্যাধিও উপস্থিত করিতে পারে না। অগ্রগামী আচার্য্য ইহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া ইতিপূর্ব্বে স্বর্গস্থ হইয়াছেন বটে,

কিন্তু সেই প্রমাণকে আরও সুদৃঢ়ভাবে মণ্ডলীর হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত অনুবর্ত্তী প্রেরিত কালীশঙ্কর যেন ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বাসীর জীবনে অসম্ভব যদি সম্ভব না হইল, তাহা হইলে পৃথিবী বিধানের মাহাত্ম্য বুঝিবে কি প্রকারে? জরা-মৃত্যু-ব্যাধিকে পরাজয়-করিয়া অমৃতের রাজ্য-স্থাপন বিধানের মহৎ উদ্দেশ্য। যাঁহারা বিধানের সংবাদবাহক তাঁহারা যদি নিজ জীবন দ্বারা ঐ সকলকে পরাজয়করিবার প্রমাণ দিয়া না যাইতে পারেন, তাহা হইলে সংসারিগণের ভয়-নিবারণ হইবে কি প্রকারে? তিনি প্রেরিতত্বে আহুত হইয়া অর্দ্ধবর্ষাধিক আট বৎসর কাল জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি চারি বৎসরমাত্র সুস্থকায ছিলেন। এ সময়ে তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রেরিতত্ব যত দূর প্রমাণিত হইয়াছে তদপেক্ষা চারি বৎসর রোগশয্যায় শয়না-বস্থায় উহা সমধিক প্রমাণিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কি অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সুতরাং উহা অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার স্বর্গারোহণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে তৎকালে (১৮১১ শকে) ধর্ম্মতত্ত্বে নিবদ্ধ হইয়াছিল; সেইটি এথানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

"ভাই কালীশঙ্কর যে কয়েক বৎসর রোগশয্যায় ছিলেন, সে সময়ে অনেক সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিজনের নিকটে আমরা এ জন্য চিরঋণে আবদ্ধ। তাঁহার রোগ অসাধ্য ছিল, সুতরাং কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অসাধ্য রোগের যাতনায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া কি প্রকারে বিশ্বাস, নির্ভর, ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরেতে আনন্দ

সন্তোষ রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য যাঁহার জীবন, তিনি কেনই বা রোগের যাতনায় অবসাদগ্রস্ত হইবেন, কেনই বা সে রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এই দৃষ্টান্তের চূড়ান্তাবস্থা দেখাইবার জন্য যেন মাসৈক পূর্ব্ব হইতে তাঁহার রোগ তাঁহাকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়াছিল। পূর্ব্বেও তাঁহার কম্প দিয়া প্রায় পক্ষে পক্ষে জ্বর উপস্থিত হইত, এবার এ কম্প ও জ্বর তাঁহার যেটুকু বল ছিল তাহা নিঃশেষ করিয়া দিল, অরুচি প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ আনিয়া উপস্থিত করিল, ত্বকস্থানের নিম্নের ক্ষত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার যে শেষ সময় উপস্থিত তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবশিষ্ট ছিল হিক্কা তাহাও সপ্তাহ পূর্ব্বে দেখা দিল। হিক্কা উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলিলেন, এই পথ দিয়া তাঁহাকে পরলোকে গমন করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিক্কার তীব্র যাতনায় অবস্থায়ও জিজ্ঞাসিত হইয়া কখন 'ভাল আছি' ভিন্ন অন্য উত্তর দিতেন না। কেবল এক দিন এক জন শ্রদ্ধেয় ভাই কিরূপ যাতনা হয় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বড়ই যাতনা। যাতনা কিরূপ জানিবার জন্য আমরা নিদান খুলিয়া দেখি তাহাতে লিখিত আছে, যকৃৎ প্লীহা অন্ত্রাদি যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এইরূপ হিক্কার তীব্র যাতনা হয়। আমরা ভাই কালীশঙ্করের উদরোপরি হস্ত রাখিয়া দেখিয়াছি, ভিতরের যন্ত্রগুলি যেন উলট্ পালট্ হইয়া যাইতেছে, অথচ এই যাতনার ভিতর তাঁহার মুখ সদা প্রশান্ত। যিনি আসিয়াছেন তাঁহাকেই প্রণামাদি করিতেছেন, বন্ধুগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন, কোন কোন সঙ্গীত আপনি বলিয়া দিতেছেন, কখন বা ভাবে গদ্গদ হইয়া আপনি

সঙ্গীত করিতেছেন। হিক্কা কথাবরোধ করিয়া আনে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত। লোকান্তরগমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া কেবল তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, রোগের অবস্থায় তিনি যে সকল রত্নলাভ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীকে দিয়া যাইতে পারিলেন না। এ সময়ে তাঁহার যে ঈশ্বরদর্শন অতীব উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক জন বন্ধু দর্শনবিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে এমনই সহজে তাহার উত্তর দিলেন যে, তাহাতেই সকলের প্রতীত হইল যে, জননী তাঁহার চক্ষুর নিকটে নিরন্তর ভাসিতেছেন। শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া যে এইটি তাঁহার বিশেষ লাভ হইয়াছে, একটি সঙ্গীত দ্বারা তিনি তাহা স্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ভাই কালীশঙ্করের বিধানের প্রতি বিশ্বাস অটল। অবতীর্ণ সত্য ও বিধিগুলির তিনি যেমন মর্য্যাদা বুঝিতেন, আমাদিগের মধ্যে ঐ সকলের মর্য্যাদা তেমন বুঝিবার লোকসংখ্যা অল্প। তাঁহার এই সকলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস অনেক সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের উদ্বেগের কারণ হইত। তাঁহার পত্নী যখন ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন, তাঁহার ঈদৃশ কুমতি কেন উপস্থিত হইল, অন্য দশ জন সংসারীর ন্যায় তিনিও অধীর হইলেন। তিনি যেন এ সময়ে অবিশ্বাসী না হন, এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। পরলোক-গমনোদ্যত আত্মাকে যাইবার সাহায্য করিতে হইবে, ক্রন্দনাদি দ্বারা তাহার উদ্বেগ বর্দ্ধিত করিবে না, সংহিতায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া এই নিয়ম প্রতিপালন জন্য পত্নীকে তিনি এরূপ ভৎর্সনা করেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে বলেন 'আমি অন্তর

রাজ্যে যাইতেছি বিশ্বাস কর। দুঃখের ভিতরে বড়ই সুখ ইহা যেন মনে-থাকে।' তিনি চরম সময় পর্য্যন্ত কেবল ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন, একটীও সংসারের কথা মুখে আনয়ন করেন নাই। অনীতি অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে ঘৃণা ছিল, তাহা এ সময়েও যে অক্ষুণ্ণ আছে, দুই এক কথায় তাহাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

"সোমবার তিনি অন্তরে প্রবেশ করিবেন কি না আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা বলি এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। খানিক পরে রোগ সমধিক পরিমাণে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া ফেলে, তখন তাঁহাকে অন্তরে প্রবেশের সময় উপস্থিত বলা যায়। সেই হইতে তিনি সংযতবাক্ হইয়া বাহ্য কথা রহিত করিয়া দেন। কখন কেহ নিতান্ত ডাকিলে অস্ফুট স্বরে তাহার, উত্তর দিয়াছেন। যাহা হউক, মঙ্গলবারের সায়ং হইতে রজনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই রোগই তাঁহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া ফেলিল; আর তাঁহার বাক্যাদিবলিবার সামর্থ্য রহিল না। রাত্রি ১০ টার পূর্ব্বে চক্ষু প্রায় পলকশূন্য হইয়া আসিল। ১১টার পর হিক্কা ঘন শ্বাসে পরিণত হইল। পর দিন বুধবার (২৪ মাঘ) ১১।৪১ মিনিটের সময়ে সহজে প্রাণ বায়ু তাঁহার দেহ হইতে বিনির্গত হইল। তিনি প্রশান্তভাবে চির নিদ্রিত হইলেন, পার্থিব সকল প্রকারের দৈহিক ক্লেশ অন্তর্হিত হইল। 'আমি মা আনন্দময়ীর ছেলে, কারেও নাহি ডরি,' এই গান চরমে পুনঃ পুনঃ গান·করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীত অর্থ-যুক্ত হইল, তিনি নির্ভয়ে মার ক্রোড়ে প্রাণসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।"

তাঁহার স্বর্গরোহণের পর ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্রের আকারে এই সংবাদটি ব্রাহ্মসাধারণকে অবগত করা যায়:—"আমরা নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জ্ঞাত করিতেছি যে, প্রায় চারি বৎসর কাল রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া বিগত ২৪ মাঘ বুধবার বেলা ১১।৪১ মিনিটের সময় শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ২টার সময়ে তাঁহার পরিত্যক্ত কলেবর কলিকাতাস্থিত সমুদায় প্রেরিত এবং ২০।২৫ জন বন্ধুবর্গ শ্মশানে লইয়া যথানিয়ম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করত: সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। আমরা সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃমণ্ডলীকে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, এই সংবাদ শ্রবণের দিন হইতে তাঁহারা নবসংহিতার ব্যবস্থানুসারে শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন। আগামী ৩ ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতে ৪ ঘটিকার সময় মঙ্গলবাড়ীতে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের গৃহে শ্রাদ্ধক্রিয়া ও ভস্মস্থাপন যথারীতি নিষ্পন্ন হইবে। শোকদুঃখে কাতরা ও অনাথ পিতৃহীন বালক বালিকাদিগকে কৃপাময় শ্রীহরি রক্ষা করুন।"

প্রেরিত কালীশঙ্করের স্বর্গারোহণের সংবাদ পাইয়া ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ চৌধুরী ধর্ম্মতত্ত্বে এই পত্রিকা প্রেরণ করেন:—"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীমৎ কালীশঙ্ক দাস মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদে আমরা সকলেই নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। এ স্থানের কোন কোন হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতারাও তাঁহার অভাবে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। যদিও বাহ্যিক সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইবে না, তথাপি তাঁহার বাহ্যিক

অভাব সহ্য করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়াছে। তিনিই বিধানালোক হস্তে লইয়া আমাদিগকে ব্যভিচাররূপ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আবর্জ্জনাপূর্ণ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমরা নিতান্ত দীন হইয়াও তাঁহা হইতেই অনেক রত্নের তত্ত্ব লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট আমরা যে ঋণপাশে আবদ্ধ তাহা কিছুতেই পরিশোধিত হইবার নহে। বিধানজননীর নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রার্থনা যে স্বর্গীয় ভ্রাতা আমাদিগকে যে অমূল্যনিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা রক্ষা ও যে সকল রত্ন আমাদের সম্মুখে ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা লুণ্ঠন করত তাঁহার সহিত আরো ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ হই, এবং সেই লুণ্ঠিত রত্ন সাধারণে বিতরণ করিয়া যেন মানবজন্ম সফল করিতে পারি।

"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার স্বর্গারোহণে ফুলবাড়ীর ব্রাহ্মগণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে অশৌচ গ্রহণ ও শোকচিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।

"১। সংবাদ প্রাপ্তি হওয়ার পর দিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা মৎস্য মাংস ভোজন করেন তাঁহারা নিরামিষান্ন এবং যাঁহারা নিরামিষভোজী তাঁহারা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কর্ত্তন করিয়াছেন।

"২। সকলেই আড়ম্বর ও বিলাসশূন্য হইয়া বৈরাগ্যের ভাবে ঐ সময় কাটাইয়াছেন।

"৩। বাহ্যিক শোকচিহ্নস্বরূপ অনেকেই কোন না কোন প্রকার গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন।

"৪। ৩ ফাল্গুন শুক্রবার সকাল বেলায় স্নানান্তে মন্দিরে সকলে সমবেত হইয়া শ্রীহরির নিকটে বিশেষ প্রার্থনা ও ভিক্ষা করত অশৌচ ত্যাগ করিয়াছেন।"

টাঙ্গাইলস্থ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার এতদুপলক্ষে ধর্ম্মতত্ত্বে এই পত্র লেখেন :—"পরম ভক্তিভাজন প্রেরিতদেব শ্রীমৎ কালী-শঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদ ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা পাঠে অবগত হইয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইলাম। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় যে কিরূপ উপকারী বন্ধু সহায় ও আত্মীয় ছিলেন তাহা আমি আর কি বলিব ? আপনারা সকলেই আমার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন, কিন্তু শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের দয়া এ দাসের প্রতি যে কত গভীর প্রাণস্পর্শী ছিল তাহা আমার লিখিবার সাধ্য নাই। আমি বিধানবিরোধী দলের অগ্রণী ছিলাম। জানি না বিধানবাদী হইয়াছি কি না, কিন্তু জীবনের বর্ত্তমান অবস্থার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট সমধিক ঋণী। প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল স্বর্গীয় প্রেরিত দেব টাঙ্গাইলে আসিয়াছিলেন, তখন আমি অন্তরে অন্তরে বিধানবিরোধী ছিলাম ; কিন্তু বাহিরে অনেকটা বিধানবাদীদিগের সাপক্ষতা প্রদর্শন করিতাম। আমি শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে নানা প্রকার কথোপকথন করি-লাম ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলাম। মনে হইল তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে তাঁহার সঙ্গে কোন স্থানে যাইতেছি, তখন তিনি আমার ভাবাপন্ন লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলি-লেন, কতকগুলি লোক সংসারে বড় চতুর। এই কথায় আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল তিনি আমাকে চিনিয়াই সঙ্কেতে আমার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের কথা ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার প্রতি আমার মন নিতান্ত অনুরক্ত হইল। তিনি যেমন আমার প্রতি সদয় হইয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন, এবং আমিও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতে

লাগিলাম। এই প্রকারে প্রেরিতমণ্ডলীর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

"শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় অতি সদালাপী ছিলেন। তিনি বৃথা আড়ম্বরের অনুরোধে দেশাচার উল্লঙ্ঘন করিতেন না। আমার প্রতি তাঁহার এমনই দয়া ছিল যে, রোগজীর্ণ দেহে তিনি এদাসের অনুবাদিত পদ্য নবসংহিতা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে এই পুস্তক কদাচ আপনাদিগের তথায় প্রেরিত হইত না।

"এ প্রদেশে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।"

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ দ্বারকানাথ দাস আমাদের অনুরোধে তাঁহার পিতৃব্যপত্নীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া বাল্যজীবনের বৃত্তান্ত সেই সময়ে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা এই :—

"ভাদ্রমাস কৃষ্ণাষ্টমী সোমবার * (এই বারসম্বন্ধে একটু গোল আছে তিথিসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই) অগ্রজ মহাশয় জন্মিয়াছিলেন। যখন ৫।৬ বৎসর বয়স তখন তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকেরা কলার খোলা দ্বারা কালীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া কচুর গাছ আদি বলিদানপূর্ব্বক খেলা করিত, তিনি কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না। খেলার স্থলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

* ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী ১৭৫৯ শকে ১০ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার গণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব রজনীতে কৃষ্ণাষ্টমীর আরম্ভ। রজনীতে জন্ম হইলে ৯ ভাদ্র বুধবার জন্মদিন স্থির হইতে পারে। গণনায় সোমবার ৬ ভাদ্র হয় বলিয়া সেই দিন আরম্ভে দেওয়া গিয়াছে।

ধ্যান বা যোগ করিতেন। তিনি বাল্যাবধি হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। অন্যান্য পূজা পার্ব্বণে তিনি তত আমোদিত বা উৎসাহী ছিলেন না; হরিসঙ্কীর্ত্তনে একান্ত উযোগী ও উৎসাহী ছিলেন। যেখানে সঙ্কীর্ত্তন হইত, সেইখানে যাইয়া কীর্ত্তন করিতেন।

"পূর্ব্বাবস্থায় প্রায় টোলে থাকিতেন, তখনকার কথা বিশেষ জানা নাই, তাঁহার টোলের আহারীয় চাউল দাউল আদি বাড়ী হইতে খরিদ করিয়া দেওয়া হইত। এক দিন বাড়ী হইতে স্নানাহার করিয়া ভাদগ্রাম বৈষ্ণবপাড়ার টোলে রওয়ানা হইয়াছেন, রাধাকান্ত বাড়ী হইতে চাউল দাউলাদি লইয়া সঙ্গে গিয়াছিল। বাড়ী হইতে রাস্তায় কুল্লীগ্রামের নিকট একটি বৃক্ষতলে কয়েক জন রামায়েত বৈরাগী বসিয়া খুঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে তিনি দেখিলেন। তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছিল। তিনিও সঙ্গী চাকরটি সহ সেই খানে বিশ্রামার্থ বসিয়াছিলেন। বৈরাগীদের ভজনগান সমাপ্ত হইলে এক জন বৈরাগী তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিকটে কোন স্থানে অতিথিশালা আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন, এবং পূর্ব্বদিন তাঁহাদের খাওয়া হয় নাই, সে দিনও সেই আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কোন স্থানে খাইতে পান নাই বলেন। কুল্লীগ্রামে কোন ভদ্রলোকের বসতি ছিল না। গৃহস্থ মুসলমান জাতিই অধিক। সুতরাং সেখানে কাহারও বাড়ীতে অতিথিশালা থাকা দূরে থাকুক, হিন্দুদিগের এক গণ্ডুষ জল পাওয়া কঠিন। নিকটে কুল্লীর খাল নামে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। তাঁহাদের আহারের জন্য সুবিধা না দেখিয়া তাঁহার বাজার খরচ হইতে কিছু পয়সা ও সঙ্গের চাল,

দাল, লবণ তৈলাদি সমস্ত তাঁহাদিগকে প্রদানপূর্ব্বক চাকরটীকে বাড়ীতে ফেরত পাঠাইয়া তিনি টোলে যান। রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মার (খুড়ীমার) কাছে সমস্ত প্রকাশ করে। রাধাকান্ত অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, আমি তাহার নিকটেও ইহা শুনিলাম।

"আর এক দিন টোলে যাওয়ার পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাস অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটি বট গাছের নীচে একটি পথিক শুইয়া আছে, তাহার জ্বরবোধ হইয়াছিল। সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র আর এক খানি সামান্য গামছামাত্র ছিল, শীতে কাঁপিতেছে দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় নিজের গায়ের কাপড় খানি তাহাকে দিয়া বাড়িতে আসিয়াছিলেন। এরূপ অনেক সময়ে নিজের কাপড় এবং মার (খুড়ী মার) নিকট হইতে পয়সা লইয়া দুঃখী কাঙ্গালীকে দিতেন।

"কোন ব্যাক্তি কোন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কাতর হইলে নিজের সাধ্যমত তাহার তত্বাবধারণ ও শুশ্রূষা এবং পথ্যা-পথ্যের সাহায্য করিতেন। এই সমস্ত কার্য্য তাঁহার বাল্যকাল হইতে স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পরে যখন চাকুরী দ্বারা নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, তখন ইচ্ছামত যে কোন লোকের উপকারার্থ ধনব্যয় করিয়াছেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, হাতে একটী পয়সা রাখিতেন না, বাড়ীর অভাব পূর্ণ হইত না। তাঁহার আত্মপর জ্ঞান ছিল না, সংসারের সকল লোককেই আপনার ন্যায় দেখিতেন, কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে নিজে কষ্ট অনুভব করিতেন। ঘৃণাবোধ তাঁহার অন্তঃকরণে বালক কাল হইতেই স্থান পায় নাই। তিনি যাহা করিতেন তাহা পরিবারস্থ কাহা-

কেও বলিতেন না, সুতরাং তাঁহার সমস্ত কার্য্য পরিবারস্থ কেহ জানিতে পারিতেন না।"

প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস কি উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বাল্যকালের এই বিবরণ পরিষ্কাররূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। তিনি নিজের জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই পরের জন্য, বাল্যকাল হইতে তিনি তাহার প্রমাণ দিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক দিনও আপনার জন্য জীবনধারণ করেন নাই, ইহার প্রমাণ সকলেই দিবেন। তাঁহার জীবনের এই বিশেষ লক্ষণের জন্য ধনী দরিদ্র সকলেরই তিনি সম্মানের পাত্র ছিলেন। যদি তিনি ধর্ম্ম-সত্য-ও-নীতি-রক্ষার জন্য তীব্রভাব প্রকাশ করিতেন, উহাও যে তাঁহার পরপ্রেমবশ্যতা হইতে সমুৎপন্ন, যিনি একবার তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রমাণ দিবেন। তাঁহার হৃদয় অতি দয়ার্দ্র ছিল, আপনি স্বর্গ হইতে যে রত্ন লাভ করিতেন, তাহা অপরকে বিতরণ করিবার উপায় যত ক্ষণ না করিতে পারিতেন, তত ক্ষণ তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। এই দয়ার প্রেরণাতেই তিনি যখন ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন প্রাপ্তধন-বিতরণের উপায়করিবার জন্য লেখনীর ব্যবহার ও তাহার প্রচারের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারের সাংসারিক প্রলোভনের অতীত ছিলেন, তাঁহাকে অধর্ম্ম ও অনীতিতে নিক্ষেপকরা যে অসম্ভব ছিল,তাহা অসদাচারী এবং তৎপ্রভাবে পরিবর্ত্তিতহৃদয় ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকারকরিয়াছেন। তিনি জ্ঞানপ্রধান বা ভক্তিপ্রধান ব্যক্তি এ কথা লইয়া বিচার উঠিতে পারে না। বাল্যকাল হইতে যিনি ভক্তিপ্রিয় ছিলেন, জ্ঞানচর্চ্চায় যিনি চিরজীবন অক্ষুণ্ণভাবে পরিশ্রম করিয়া

ছেন, তত্ত্বসম্পর্কীয় বিষয়গুলি যিনি করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় দর্শন করিতেন, শ্রীচৈতন্য ও গৌতমকে যিনি জীবনে এক করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাতে জ্ঞান ও ভক্তি যে এক ছিল, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। ভক্তি ও জ্ঞান পুণ্যের ভূমির উপরে স্থাপিত, সুতরাং তাঁহার জীবন যে নীতির তীব্রভাব ব্যক্ত করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাঁহার কার্য্যপ্রিয়তা সপ্রমাণিত করিবার জন্য কোন প্রয়াসের প্রয়োজন নাই, কেন না তাঁহার চারি বৎসর অচল হইয়া শয্যায় স্থিতি, এই কার্য্যপ্রিয়তা হইতে ঘটিয়াছিল। তিনি কি প্রকার কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন, তাহা তাঁহার রোগশয্যা নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। জনহিতৈষিতা তাঁহাকে যে কখনও পরিত্যাগ করে নাই, রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও অনেকের দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং আরোগ্যসম্পাদন করিয়া আমাদিগকে তিনি বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রেরিতত্বোচিত উৎসাহ—যাঁহারাই যে সময়ে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন অক্ষুণ্ণ উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের সহিত দুই তিন ঘণ্টা ব্যাপী আলাপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই উৎসাহের আবেগে যে তিনি আপনার রোগ ও যাতনার অবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইতেন, ইহা আর কে না দেখিয়াছেন? তিনি যাহা বলিতেন আপনি তাহা করিতেন তাঁহার সমগ্র জীবন তাহার পরিচয়। তাঁহার বন্ধুগণ আজও স্মরণ করিবেন, তাঁহার বন্ধুতা কেমন অচ্ছেদ্য ছিল। তিনি একবার যাঁহার নিকটে যে উপকার পাইয়াছেন, তাহা চিরজীবনেও যে ভুলিতেন না, ইহার প্রমাণ অনেক আছে। তিনি আপনার পরিবারের প্রতি কি প্রকার অনুরক্ত ছিলেন, তাহাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া

পারিবারিক সম্বন্ধ অব্যাহত রাখিতেন, ইহার যে প্রমাণ তিনি দিয়াছেন আমরা সে প্রমাণ জীবনে কখন বিস্মৃত হইব না। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিব, তিনি যে বিধানের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা আপনার জীবনে ও মরণে আত্মাতে প্রতিফলিতকরিয়া তদনুসরণে সমগ্রজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এই এক কথা বলিয়া আমরা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পরিসমাপ্ত করিতেছি।

